পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

(রাজনীতি খন্ড)

আতিকুর রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

(রাজনীতি খন্ড)

আতিকুর রহমান

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি (রাজনীতি খন্ড)

আতিকুর রহমান

প্রকাশক	ঃ	গ্রন্থকার
গ্রন্থ স্বত্ব	ঃ	গ্রন্থকারের
প্রথম প্রকাশ	ঃ	মার্চ ১৯৯৩ খ্রীঃ রাংগামাটি
পরিবেশক	ঃ	রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।
প্রচ্ছদ শিল্পী	ঃ	রতন দাশ
কম্পোজ ও মুদ্রণ	ঃ	সুলেখা ছাপাঘর ৪৩, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
কম্পিউটার তত্ত্বাবধানে	ঃ	জগদীশ দেব নাথ

মূল্য ঃ
সাদা কাগজ বোর্ড বাঁধাই টাঃ ৮০/০০
নিউজ প্রিন্ট বোর্ড বাঁদাই টাঃ ৬৫/০০

www.pathagar.com

এই লেখকের কিছু প্রকাশমান বইঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি
(ইতিহাস খন্ড ও রাজনীতি খন্ড)

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের রূপ ও রহস্য—১ম ও
২য় খন্ড

www.pathagar.com

পূর্বকথা!

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অশান্ত অঞ্চল। নেহাত জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনে প্রচলিত তথ্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হতে না পেরে এবং শান্তি স্থাপনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ও বটে, আমি স্থানীয় পত্র পত্রিকায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার অধিবাসী উপজাতিদের ইতিহাস রাজনীতি ও পার্বত্য নিসর্গ আলোচনায় নিযুক্ত হই। এই বৈচিত্রময় তথ্যবহুল আলোচনার ভিত্তি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত ঔৎসুক্যে সংগৃহীত বহু অভিনব, আর পন্ডিতজনদের রচনা জাত দুর্লভ তথ্য উপাদান।

পর্বতবাসী গুণী জনদের প্রায় সবাই হয় চাকুরী, না হয় বাণিজ্য চর্চায় নিয়োজিত– মূখ্য উদ্দেশ্যঃ ভাগ্য গড়া। আমি সে মহাজনী পন্থা অবলম্বন করেও কামাই রোজগারের অধিকাংশ ঢেলে দিয়েছি অকাজের রাজনীতি ও ইতিহাস চর্চায়। আমার মেধাও শ্রমশক্তির বৃহতাংশ ব্যয় হয়েছে তথ্যানুসন্ধান গবেষণা ও লেখা লেখিতে। সুতরাং সম্পদ নয়, কিছু কীট দষ্ট কাগজ পত্রই আমার সঞ্চয়। অভাবগ্রস্ত স্ত্রী ছেলে মেয়ে এবং একটি পর্ণকুটির আমাকে অতিষ্ট করে না রাখলে, হয়তো জাতীয় প্রয়োজনের পক্ষে উপযোগী আরো কিছু দুর্লভ তথ্য যোগানদান আমার দ্বারা সম্ভব হতো। পৃষ্ঠ পোষকতা লাভের ভাগ্য আমার নেই। আমার তথ্য সম্ভারের দ্বারা জাতি ও দেশ উপকৃত হবে এই প্রেরণায়, সম্পত্তির বিনিময়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপলাতি সংক্রান্ত তিন খন্ড বই প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হলাম। ইহা আমার ছেলে মেয়েদের মুখের গ্রাস হরণের সামিল। সময়ের তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে প্রথম খন্ডে রাজনীতি আলোচিত হলো। যদি বিনিয়োগ ফিরত আসে বা প্রকাশক পাই তা হলে ইতিহাস সম্বলিত দ্বিতীয় খন্ড এবং পরিবেশ পরিচিতি সংক্রান্ত তৃতীয় খন্ড ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। সে পর্যন্ত আয়ুকাল আছে কিনা তা–ও অনিশ্চিত।

অশান্তি ও বিদ্রোহ দূরিকরণে শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হলেও স্থায়ী শান্তি স্থাপনে যুক্তির প্রয়োগ সর্বাগ্রগণ্য। শক্তি সাময়িক দমানোর মাধ্যম। কিন্তু যুক্তি স্থায়ী কার্যকর অস্ত্র। এই অব্যর্থ স্থায়ী অস্ত্রটির বিনির্মাণ ও প্রয়োগে আমি অসহায়ভাবে একা। অথচ শান্ত করণ ও শান্তি স্থাপনের অস্থায়ী প্রক্রিয়ার পিছনে শক্তি ও সম্পদের দেদার অপচয় অব্যাহত আছে। আমার এ উপলব্ধি আত্ম স্বার্থ কেন্দ্রিক ভাবা অনুচিত। এই উপদ্রুত অঞ্চলে সত্য কথন বিপজ্জনক। সশস্ত্র অসন্তুষ্ট পক্ষ তজ্জন্য যে কোন সময় চড়াও হতে পারে। উপদ্রবের ভিতর বসবাস করে বিপক্ষদের ক্ষেপিয়ে, নিরাপদ থাকা সহজ নয়। একারণে সপক্ষের কেউ কেউ আমাকে বর্জন করেও চলেন। তাদের ধারণাঃ আমার দ্বারা তারাও শত্রুতে পরিণত

www.pathagar.com

হবেন। এ কারণে অনেকের সত্য তথ্য প্রচারে অনীহা। তাই হুশিয়ার ও স্বার্থ সচেতন অনেকের কাছে আমার এ বিপজ্জনক লেখালেখি আহম্মকী দুঃসাহস। এতে আর্থিক লাভের আশাও শূণ্য। যে কোন সময় প্রাণ ও যেতে পারে। এসব কথা বিবেচনায় রেখেই, সত্য তথ্য, শান্তি ও জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনে করি, মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করাই উত্তম। তজ্জন্য শহিদী মৃত্যু এলেও তাকে স্বানন্দে স্বাগতম।

আবেগ উত্তেজনাকে দমিয়ে রেখে যুক্তি ও তথ্যের পক্ষপাতিত্বহীন চর্চাকে আগা গোড়া বজায় রাখা সম্ভব হয় নি । হানাহানি-পুর্ণ তপ্ত মুহূর্তে লিখিত কয়েকটি রচনায়, ঐ সময়ের উত্তাপ উত্তেজনা স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে। উহা সংশোধণ করাও সম্ভব নয়। তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আমার মূল উদ্দেশ্য শান্তি সুস্থিতি ও কল্যাণ, বিদ্বেষ চর্চা নয়। সম্ভাব্য আহত পক্ষের ন্যায্য ও যুক্তি সঙ্গত দাবী দাওয়ার পক্ষে ও আমি অনেক জোরালো সমর্থণ ব্যক্ত করেছি। তাতেই তারা সান্ত্বনা পাবেন, এই, আশা রাখি।

সাহিত্যিক ও তত্বগত বিচারে আমার রচনা গুলি উত্তম মানের সে দাবী আমি করিনা। আমি কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বা উচ্চ ডিগ্রীধারী পণ্ডিত নই, নবিস জ্ঞান সাধক। আমার এ সাধনা মানবিক শান্তি সুস্থিতি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতিদের জানা ও বুঝার জন্য একটি তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র খোলা উচিত। শুধু উপজাতীয় পণ্ডিতদের তাতে বসিয়ে দেওয়া ও ঠিক নয়। এ পর্যন্ত তাদের দ্বারা লিখিত বই পুস্তক ও সাময়িকী গুলিতে, স্থানীয় তথ্য সংক্রান্ত আত্মকেন্দ্রিক বাহুল্য চর্চাই অধিক হয়েছে। নিরপেক্ষ মৌলিক তথ্যের প্রয়োজনে ইহা বর্জনীয়।

তাং-রাঙ্গামাটি ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৯৩ খ্রীঃ

বিনীতঃ

গ্রন্থকার
গবেষক ও পরিচালক
পার্বত্য চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রকল্প।
১৩ এ (৩) কাসেম বাজার, রাঙ্গামাটি।

www.pathagar.com

বিষয়সূচীঃ

১।	পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন ও বহিরাগমন।	পৃঃ ১—৫
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা দাবী ও তার মূল্যায়ণ।	৬—২৪
৩।	পার্বত্য রাজনীতির নতুন ১৩ দফা।	২৫—২৯
৪।	ইতিহাস, রাজনীতি ও পার্বত্য উপজাতি।	৩০—৪৩
৫।	দাবী দাওয়া আন্দোলন ও সমঝোতা।	৪৪—৫৫
৬।	প্রশাসনিক এখতিয়ার ও সংজ্ঞা।	৫৬—৬৩
৭।	পর্বতাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা।	৬৪—৬৮
৮।	শান্তি, সম্প্রীতি, পরিবেশ।	৬৯—৭৪
৯।	অশান্তি অসন্তোষ কী ও কেন।	৭৫—৭৭
১০।	চাওয়া পাওয়ার আরো আছে।	৭৮—৮১
১১।	রাজনৈতিকপরিস্থিতি।	৮২—৯৬
১২।	সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গ।	৯৭—১০৯
১৩।	উপজাতীয় অধিকারের বিতর্ক।	১১০—১২৮
১৪।	পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট।	১২৯—১৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন ও বহিরাগমন

স্থানীয় অবাঙ্গালীসহ তাদের সমর্থক অনেকের ধারণা হলোঃ এতদাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ ঘটছে, যদ্দরুণ সরল নিরিহ আর পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু স্থানীয় অবাঙ্গালীদের সংখ্যা সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য আর ভৌমিক অধিকার বিপন্ন। তারা এ দাবীর সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে আদম শুমারীর পরিসংখ্যান ও পূনর্বাসিত বাঙ্গালীদের দ্বারা তাদের বাড়ী ঘর ও জমিজমা দখলের ঘটনাদিও উপস্থাপন করেন। কিন্তু কেউই তলিয়ে দেখেন না যে, বহিরাগত অভিবাসী অবাঙ্গালীদের দ্বারা, স্থানীয় আদিবাসী বাঙ্গালী ও অন্যান্যরা, একদা সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়েছেন। ঐ বহিরাগত অধিবাসীদের বংশধরগণ, স্থানীয়দের তুলনায় অধিক সরল নিরিহ আর পশ্চাদপদও নয়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পদ সম্পত্তি আবাস আয়োজনের বিচারে তারা বাংলাদেশে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত উন্নত শ্রেণীর লোক। তাদের মাঝে উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী চরিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গুণগত বিচারে তারা উন্নত সুসভ্য মানুষ। বাহ্যিকভাবে বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলে সংখ্যালঘু। ভাষা, সংস্কৃতি রং ও গঠনেও অবাঙ্গালীদের সাথে তাদের তফাৎ মৌলিক। ইহাকে বৈচিত্র্য বলা যায়, ভিন্ন জাতীয়তা নয়। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি অধিকাংশ অবাঙ্গালীর ঐতিহ্য। তবে চাকমারা অনেকাংশেই ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক। তাদের ভাষা এক ধরণের আঞ্চলিক বাংলা। সাজ পোষাকেও তাদের মাঝে হিন্দুয়ানী অনুকরণ বিদ্যমান। তবে সর্দারী সাজ পোষাক দরবারী মোগলাই। খুটি নাটি বিচারে তাদেরকে মঙ্গোলীয় শ্রেণীর বাঙ্গালী বলা যায়। ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম বাদে অবশিষ্ট অবাঙ্গালীরা বর্মী আরাকানী ও আসামী বংশোদ্ভূত। চাকমারা চরিত্রে আংশিক বাঙ্গালী হলেও, পূর্ববাসস্থানের বিচারে দেশত্যাগী আরাকানী। এই সব বহির্দেশীয়দের আগমন কাল হলো মোগল আমলের শেষ থেকে গোটা বৃটিশ আমল।

বৃটিশ আমলে রেকর্ডকৃত তাদের আগমন নির্গমনের হিসাবেও অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি ধরা পড়ে। তিন সর্দারের প্রদত্ত বাৎসরিক জুমিয়া সংখ্যা এবং আদম শুমারী গুলিতেও, তাদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণিত হয়। বার্মার সাথে সংঘটিত ১৮২৪ সালের যুদ্ধ, সে দেশের উদ্বাস্তু জনিত তিক্ততারই ফল। বৃটিশ সরকার, তাদের আরাকানী উদ্বাস্তু প্রজাদের, এদেশে বসবাসে নমনীয়তা প্রদর্শন করে, অভিবাসনের সুযোগ প্রদান করেন। তাতেই তারা এতদাঞ্চলে সংখ্যাগুরু। যদি এখানে কাউকে বহিরাগত বলতে হয়, তা হলে সে পরিচয়টি ঐ উদ্বাস্তু

www.pathagar.com

বংশধরদেরই প্রাপ্য। তারা সরকারীভাবে রেকর্ডকৃত বিদেশী। এদেশের স্থানীয় অধিবাসী নয়। কুকি নামীয় লোক আর কিছু বাঙ্গালী মাত্র এখানকার প্রাচীন বাসিন্দা। তারা আদিবাসী পাহাড়ী নামে সংজ্ঞায়িত হওয়ার যোগ্য। তাদের সংখ্যায় যোগ-বিয়োগের অর্থ স্বদেশেই আগমন নির্গমন-বেআইনী বহিরাগমণ নয়। এর বিপরীতে অবাঙ্গালীদের অধিকাংশ বিদেশী বংশোদ্ভুত, তথা বহিরাগত প্রজন্ম। এ দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি বিবেচ্যঃ-

প্রমাণনং-১।

রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রত্ন নিদর্শনঃ রাজা শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীল মোহর, যার ভাষ্য হলোঃ "রোসান, আরাকান, আল্লাহ রাব্বি, ১১১১ শের জব্বার খান।" ইহার দ্বারা বুঝা যায়, ঐ রাজার সময়কালে চাকমাগণ আরাকানের রোসাং অঞ্চলে ছিলেন। তাঁর সর্দারীকাল, ঐ সীল মোহর অনুযয়ী ১১১১ মঘী মোতাবেক ১৭৪৯ খ্রীঃ সালে শুরু। বিভিন্ন বিবরণে ১৭৬৫ খ্রীঃ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। ঐ সালটিতে চট্টগ্রামের অন্তর্ভূক্ত, এতদাঞ্চলে বৃটিশ শাসনের সূচনা ঘটে।

দ্রষ্টব্য, বর্ণিত সীল মোহর

প্রমাণনং-২।

তৎপূর্বে আদি চাকমা রাজা বলে খ্যাত জনৈক শের মস্ত খাঁ, কিছু চাকমা অনুসারীসহ চট্টগ্রামের মোগল ফৌজদার জুল কদর খাঁনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে কোদালা উপত্যকায় পূনর্বাসিত হোন। তিনিও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন আরাকান ত্যাগী উদ্বাস্তু। তাঁর ঐ দেশত্যাগ ও পূনর্বাসনের কথা অধ্যাপক এ এম, সিরাজুদ্দিন "অরিজিন ওফ দি রাজাজ অফদি চিটাগাং হিলট্রাক্টস" নামীয় একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ইহার আরো আগে ১৭১১ খ্রীঃ সালে আরাকান ত্যাগী রতন খাঁ দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর শেষ বংশধর জালাল খাঁ ১৭২৪ সালে মোগলদের দ্বারা অবাধ্যতার অপরাধে দলবল সহ আক্রান্ত ও বিতাড়িত হোন। ওদের সাথে চাকমাদের রক্তগত সম্পর্ক থাকা সমর্থিত নয়। ওদের কথাও অধ্যাপক এ এম, সিরাজুদ্দিন সাহেবের প্রবন্ধে উল্লেখিতআছে।

www.pathagar.com

প্রমাণনং-৩।

চাকমাদের বহুল চর্চিত একটি লোক গীতিতেও গর্বের সাথে স্বীকার করা হয় যে, তাদের পূর্ববর্তী বাসস্থানগুলির একটি হলো আরাকানের রোসাং, যথাঃ চাকমা লোকগীতিঃ

আদি রাজা শের মস্ত খাঁ, রোয়াং ছিলো বাড়ী,
তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।"

তাদের আরেক স্বদেশ ভূমি হলোঃ অখ্যাত অজ্ঞাত এক চম্পক নগর, যথাঃ লোকগীতিঃ

"এলে মৈসাং লালচ নেই
ন এলে মৈসাং কেলেস নেই
চল্ ভেই লোগ চল যেই
চম্পক নগর ফিরি যেই।"

প্রমাণনং-৪।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলার প্রথম জিলা প্রশাসক মিঃ টি, এইচ লুইনকে, এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা হয়ে থাকে। তিনি স্বীয় পুস্তক "দি হিল ট্রাইবস অফ চিটাগাং এণ্ডদি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন" এর ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেনঃ

"A greater portion of the hill tribes, at present living in the chittagong. Hills, undoubtedly came about two generations ago from Aracan. This is asserted both by thair own traditions and by records in the Chittagong Collectorate."

বাংলাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাসিন্দা উপজাতিদের অধিকাংশ, নিঃসন্দেহে প্রায় দুই পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। তাদের ঐতিহ্য আর চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে রক্ষিত দলিল পত্র, এই দুই সূত্রে দৃঢ়তার সাথে একথাটি বলা যায়।

প্রমাণনং-৫।

১৭৮৭ খ্রীঃ সালের জুন মাসে, চট্টগ্রামের বৃটিশ শাসককে লিখিত আরাকানের রাজার চিঠিতে নিম্নোক্ত তথ্যটি উল্লেখিত আছেঃ

"Dumcan Chakma and kiecopa, lies, Maring and other

www.pathagar.com

inhabitants of Aracan have now absconded and taken refuge, near the mountains within your border ....."

Ref: The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein page 29 By Mr. T. H. Leween.

বাংলাঃ দোমকান (দৈংনাক) চাকমা, কায়কোপা (কুকি) লাইজ (লুসাই) মেরিং (মুরং) এবং অন্যান্য অনেক আরাকানবাসী স্বদেশ ত্যাগ করে, আপনাদের সীমান্তের পাহাড়গুলির পাশে আশ্রয় নিয়েছে।

সূত্রঃ দি হিল ট্রাক্টস ও ফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন। লেখকঃ মিঃ টি এইচলুইন। পৃঃ২৯।

প্রমাণনং-৬

১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক, আরাকান রাজ্য দখল ও তথায় অনুষ্ঠিত উৎপীড়ণের ফলে সে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তখন উদ্বাস্তু আরাকানীরা স্বদেশ উদ্ধারের জন্য অভিযান ও চালাতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত আভা সরকার ও বিদ্রোহী আরাকানীদের মাঝে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষ গুলি উদ্বাস্তু আগমনকে আরো বাড়িয়ে তুলে এবং তাতে বার্মা ও বৃটিশ উভয় সরকারের মাঝে তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। ঐ সালেই উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আরাকান বৃটিশদের দখলিভূত হয়ে, ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। তখনকার ঐ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আরাকানীদের দীর্ঘ অবস্থানের কারণে, আশ্রয়দাতা দেশই তাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালীগণ পটুয়াখালির মগ ও কক্সবাজারের রাখাইনরা, সেই তাদেয়ই বংশধর। চাকমারাও সেই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ।

সূত্রঃ দি হিষ্টি অফ বৃটিশ ইন্ডিয়া পৃঃ ৩৫৫/লেখক মিঃ মেকফার্লেন ও নেরেটিভ অব দি বার্মিজ ওয়ার পৃঃ ২৫ লেখকঃ মিঃ উইল সন্স)।

প্রমাণনং-৭।

১৫৫০ খ্রীঃ সালে অংকিত বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের একটি প্রাচীন মানচিত্রে পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও দে বারোজ একটি চাকোমা নামীয় অঞ্চল প্রদর্শন করেছেন, যা রাইংখ্যং ও সুবলং উপনদীগুলির উৎস অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত। ইহাতেও প্রমাণিত হয়, উত্তর আরাকান চাকমাদের আবাস ভূমি ছিলো।

www.pathagar.com

প্রমাণনং-৮।

আরাকানের মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েই চাকমাগণ এতদাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। উহা তাদের লোক গীতির দ্বারাও সমর্থিত। যথাঃ

"ঘরত গেলে মগে পায়

ঝারত গেলে বাঘে খায় –

ইত্যাদি।

প্রমাণনং-৯।

বৃটিশ সরকার সর্বপ্রথম ১৯০০ খ্রীঃ সালে আইনের দ্বারা অধিকাংশ বহিরাগত অবাঙ্গালীর রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে, এতদাঞ্চলে তাদেরকে অভিবাসী বলে ঘোষণা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১/১৯০০ এর ৫২ ধারাই তার প্রমাণ, যথাঃ

Immigration into the Hill Tracts.

Save as here in after provided, no person other than a chakma, Mogh or a member of any hill tribe, indigenous to the Chittagong Hill tracts, the Lushai hills, the Aracan hill tracts, or the State of Tripura, shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts, unless he is in possession of a permit granted by the Deputy. Commissioner at his discration.

বাংলাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী থাকা ব্যতিরেকে চাকমা মগ অথবা এমন কোন উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, পার্বত্য আরাকান অঞ্চল অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী পাহাড়ী বাসিন্দা বলে পরিচিত, এমন লোক ব্যতীত অপর কেহই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ অথবা বসবাস করতে পারবেনা, যদি না তার অধিকারে জিলা প্রশাসকের প্রদত্ত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

এই আইনে চাকমা ও মগদের উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলা হয়নি। তারা বিদেশাগত বাসিন্দা তথা অভিবাসী। লুসাই ত্রিপুরা আর অন্যান্য আরাকানীরাও স্থানীয় অধিবাসী নয়। এসবের প্রতি স্থানীয় উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী জ্ঞাপক সংজ্ঞার অপপ্রয়োগ একটি প্রচলিত বিভ্রান্তি।

রচনাকালঃ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা

(ক) পর্য্যালোচনা

সুখের কথাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবীনামা সংশোধন করে কিছু নমনীয়তা প্রদর্শণ করেছেন। এবার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রত্যাহৃত হয়ে তদস্থলে বিশেষ আইনের আওতায় স্বায়ত্ত শাসিত আঞ্চলিক পরিষদের দাবী সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু প্রদেশের মত ইহাও ফেডারেল ষ্টেটের ব্যাপার, ইউনিটারী ষ্টেট ব্যবস্থা নয়। এখানেই ইউনিটারী ষ্টেট ব্যবস্থা সম্বলিত বাংলাদেশ সংবিধানের বাঁধা। দাবীটিতে সংবিধানের সংশোধন দাবী করা হয়েছে। কিন্তু উহা জটিলতায় আবদ্ধ।

এখন সারাদেশে জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো নিয়ে স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। অঞ্চল বিশেষের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করার দ্বারা সে স্থিতিশীলতা ক্ষুন্ন হবে। উহা রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সূচকও হতে পারে। সুরাং বিষয়টি সুদূর প্রসারী গুরুত্ববহ। ইহা সহজ বিবেচ্য আঞ্চলিক ব্যাপার মাত্র নয়। একদা গোটা জাতি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য দুর্বার না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেল রাষ্ট্রে উত্তরণও সহজ নয়। এ সংক্রান্ত সংশোধনী একটি মৌলিক সাংবিধানিক বিষয়। সম্ভবতঃ গণভোটে গোটা জাতির সম্মতি লাভ তজ্জন্য দরকার হবে। যা সহজ প্রাপ্য ভাবার অবকাশ নেই; এবং সময় সাপেক্ষও বটে। এই অনিশ্চিত সংশোধনীর অপেক্ষায় শান্তি স্থাপন ব্যাপারটিকে প্রলম্বিত রেখে, হানাহানিতে লিপ্ত থাতাও সমীচীন ভাবা যায় না। নীতিগতভাবে স্বায়ত্তশাসন আদায় অন্যায় কিছু নয়। ইহা মানুষের বৈধ রাজনৈতিক আশংখারই বিষয়। তবে আংশিক নয়, জাতীয়ভাবে উহার পক্ষে দুর্বার আকাংখা না জাগা পর্যন্ত গণভোটে উহার প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং আপাততঃ বিকল্প স্থানীয় শাসনেই সন্তুষ্ট থেকে শান্তিকে গ্রহণ করা উচিত। ইহা নিরুপায় অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে মান্য হতে পারে। এখানে একটি প্রশ্ন উথাপন অনিবার্য যে, প্রদেশ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানে সাংবিধানিক অপারগতা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার প্রতি ও কি প্রযোজ্য নয়? ক্ষমতা ও গঠন প্রণালীর বিচারে উহা ও কার্যতঃ আঞ্চলিক সরকার। এক সঙ্গে শাসন বিচার ও আইন প্রণয়নের সরকার–প্রাপ্য কর্তৃত্ব উহার উপর ন্যস্ত। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে স্বনামে নয় বেনামে হলেও উহা সরকারী স্বায়ত্ত শাসন সম্পন্ন রাজ্য বা অঞ্চল রূপে বিবেচ্য। পার্বত্য জন সংহতি সুমিতির দাবীকৃত আঞ্চলিক পরিষদে ক্ষমতার পরিমাণ কিছু বেশী, এই তফাতই মাত্র ধর্তব্য।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ইহা স্বীকার্য যে, সাংবিধানিক ব্যবস্থার সাথে স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইহা বিশুদ্ধ স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ও নয়। উহার বিধি বিধান ও গঠন পদ্ধতির অনেকটুকুই ত্রুটিপূর্ণ। স্থানীয় শাসন ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিষদের বিধি বিধান ও গঠন পদ্ধতি নির্ণয় কালে ত্রুটিগুলির সংশোধন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে জন সংহতি সমিতির প্রদত্ত আঞ্চলিক পরিষদের গঠনতন্ত্রে অনেক উন্নত রুপরেখা বিদ্যমান যা নির্দ্বিধায় অনুকরণীয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, আইনের বিশেষজ্ঞ, এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আদালতই, রাজনীতি বিজ্ঞান ও সাংবিধানিক আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দাতা কর্তৃপক্ষ। দাবী ও প্রশ্নগুলির চূড়ান্ত ফয়সালায় তাদের নিকট তাত্বিক ও বিধিগত সোপারিশ আহবান করা উচিত। বিষয়টির সাথে রাজনীতি জড়িত হলেও রাজনীতিক মাত্রই তাত্বিক ও আইনজ্ঞ স্বীকার্য নন। ভাবাবেগ ও ইচ্ছাকে দমিয়ে তত্ব আইন ও বাস্তবতাকে মেনে অগ্রসর হতে হবে। আন্দোলন মাত্রই গ্রহণীয় নয়। যুক্তি মান্যতা তাতে ও প্রযোজ্য। ইতিহাস মান্যতাকেও এক্ষেত্রে পরিহার করা যাবে না। বাঙ্গালীরা বাংলাদেশ ভূখন্ডের আদিও মুল অধিবাসী। মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে এতদাঞ্চলে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, এই বাস্তবতা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাপ্ত। ইহা চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। স্থানীয় রাজনীতিতে ইহা মৌলিক অনুসরণীয় বিষয়।

খ) দাবী ও দফা ওয়ারী মূল্যায়ণ

দাবীঃ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন (Amendment) করিয়াঃ

(ক) পাবর্ত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

মূল্যায়ণঃ বিশেষ শাসন ও বিশেষ শাসিত অঞ্চলের ধারণা মূলতঃ ফেডারেল ষ্টেটের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইউনিটারী বাংলাদেশ ষ্টেটেরই একটি অংশ। বিশেষ শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দানের প্রতি বিধিগত সমর্থন, সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত নেই। পৃথক শাসিত অঞ্চল মানে বেনামে রাজ্য বা প্রদেশ, এবং স্বায়ত্ত শাসন মানে, প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য ভিত্তিক ক্ষমতা। আঞ্চলিক পরিষদের ভিতর, এ চরিত্র গুলির আত্মি-করণ, বিধিগত ভাবে সম্ভব নয়। পৃথক শাসন, স্বায়ত্ত শাসনেরই নামান্তর; এবং পৃথক শাসিত অঞ্চলের মানে রাষ্ট্রের এক কেন্দ্রিকতা পরিহার। ইহা সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার গুরুতর ভিন্নতা।

www.pathagar.com

সংবিধানের মৌলিক সংশোধন ও গণভোট ভিত্তিক জাতীয় সমর্থন ভিন্ন, এ বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব নয়। ফেডারেল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি জাতীয় সমর্থন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, সাংবিধানিক বাধার কারণেই, স্বায়ত্ত শাসন ও পৃথক শাসিত অঞ্চলের দাবী অমীমাংসিত থাকতে বাধ্য। যে কারণে স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ গঠন সম্ভব নয়, সেই একই কারণে স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল গঠন ও বাধাগ্রস্ত। এখন স্থানীয় শাসন ভিত্তিক ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দাবীকৃত ৩৬টি ক্ষমতা সম্বলিত–আঞ্চলিক সরকারের হাতে শাসন বিচার ও আইনের ক্ষমতা ন্যস্ত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল অঙ্গ রাজ্য বা প্রদেশের মর্যাদাই লাভ করে। সুতরাং প্রস্তাবটি বাংলাদেশ সংবিধানের ইউনিটারী বা এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র কাঠামো পরিকল্পনার বিরোধী, তাই এই ধারণা পরিত্যজ্য।

দাবীঃ ১। (খ) আঞ্চলিক পরিষদ (REGIONAL COUNCIL) সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

মূল্যায়ণঃ সরকার তিন পার্বত্য জেলায় তিন স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইহার অতিরিক্ত বৃহত্তর আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা নীতিগত ভাবে অনুমোদনীয়। তবে উহার গঠন ও ক্ষমতা কাঠামো হবে স্থানীয় শাসন ভিত্তিক। শাসন বিচার ও আইন প্রণয়নের ক্রয়ী সরকারী ক্ষমতা তার প্রাপ্য নয়। ইহা ইউনিটারী ষ্টেট ব্যবস্থার পরিপন্থী। স্বায়ত্ত শাসন প্রাদোশীক বিষয়।

দাবীঃ ১। (গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

মূল্যায়নঃ পরিষদের একটি কার্য নির্বাহী অংশ থাকা দায়িত্ব সম্পাদন ও জবাব দেহিতার পক্ষে অধিক সুবিধা জনক। ইহা সংসদীয় পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুন্দর প্রস্তাব।

দাবীঃ ১। (ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, আদেশ নোটিশ প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

মূল্যায়নঃ ইউনিটারী বা এক কেন্দ্রিক বাংলাদেশে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা

www.pathagar.com

একমাত্র জাতীয় সংসদেরই প্রাপ্য। তবে ঐ আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদেশ জারি ও নোটিশ প্রদান অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়িত্ব পালনেরই অংশ।

দাবী ঃ ১। (ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে।

মূল্যায়নঃ ইহাঅনুমোদনীয়।

দাবীঃ ১। (চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে- (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা, (২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, (৩) পুলিশ, (৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৫) কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন, (৬) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, (৭) বন, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ৮) গণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, (৯) আইন ও বিচার, (১০) পশু পালন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, (১১) ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত, (১২) ব্যবসা বাণিজ্য (১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, (১৪) রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা, (১৫) পর্যটন, (১৬) মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, (১৭) যোগাযোগ ও পরিবহন, (১৮) ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্বকরণ, (১৯) পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ (২০) হাটবাজার ও মেলা, (২১) সমাজ কল্যাণ, (২৩) অর্থ, (২৪) সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান, (২৫) যুব কল্ব্যাণ ও ক্রীড়া, (২৬) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা (২৭) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা (২৮) সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি (২৯) মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহ, (৩০) গোরস্থান ও শ্মশান, (৩১) দাতব্য প্রতিষ্ঠান আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার, (৩২) জন সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা, (৩৩) জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন (৩৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৩৫) কারাগার, (৩৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্ব পুর্ণবিষয়।

www.pathagar.com

মূল্যায়ণঃ (১) ইউনিটারী ষ্টেটের প্রত্যন্ত ক্ষুদ্রতম অঞ্চলেও সরাসরি ভাবে কেন্দ্রীয় শাসন ও আইন শৃঙ্খলার পরিধি ব্যাপ্ত। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি অনুমোদনীয় নয়। কেবল সহযোগীর মর্যাদায়, স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষমতাই আঞ্চলিক পরিষদের প্রাপ্য।

(২) জেলা পরিষদ, পৌর সভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের উপর তত্বাবধানের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত করা যায়-। সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রাপ্য।

(৩) যেহেতু আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বকেন্দ্রীয় সরকারের, সেহেতু উহা বাস্তবায়নের বাহন পুলিশ বাহিনীকে ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হবে। তবে স্বেচ্ছা সেবক আকারের একটি বাহিনী আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত করা যায়, যারা হবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে নিরস্ত্র সহযোগী।

(৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (৫) কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন (৬) কলেজ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, (৭) বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (৮) গণস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এই খাতে গুলির তত্বাবধান, পরিচালনা ও উন্নয়নে আঞ্চলিক পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ আপত্তিজনক হওয়ার কথা নয়। (৯) আইন ও বিচার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত বিষয়। এর সাথে শাসন প্রশাসন ও যুক্ত। এই ত্রয়ী কর্তৃত্ব-স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য নয়। (১০) পশু পালন ও সংরক্ষণ আপত্তিজনক নয়। (১১) ভূমি ক্রয় বিক্রয় ও বন্দোবস্তি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। ইহা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিকদের অগ্রাধিকার বিবেচ্য। (১২) স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তার সুবিধা দান আঞ্চলিক ভাবে পরিচালিত হতে পারে। তবে আন্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। (১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অনুমোদনীয়। (১৪) জাতীয় মহা সড়ক বাদে আঞ্চলিক রাস্তা ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ণে আঞ্চলিক পরিষদকে ক্ষমতা দান বাঞ্ছনীয়। (১৫) পর্যটন (১৬) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণা বেক্ষণ (১৭) যোগাযোগ ও পরিবহণ এই খাতগুলি হস্তান্তর যোগ্য। (১৮) ভূমি

www.pathagar.com

রাজস্ব ও আবগারী শুল্ক কেন্দ্রীয় বিষয়। তবে কিছু স্থানীয় করের খাত সৃষ্টিকরা যেতে পারে। (১৯) পানি ওবিদ্যুৎ সরবরাহ (২০) হাটবাজার ও মেলা নিয়ন্ত্রণ (২১) সমবায় পরিচালনা (২২) সমাজ কল্যাণ এই খাত গুলি অনুমোদনীয়। (২৩) অর্থ একটি গুরুতর জাতীয় বিষয়। ইহার নিয়ন্ত্রন ভার কেন্দ্রেরই প্রাপ্য। তবে স্থানীয় তহবিলের নামে একটি খাত রাখা বাঞ্ছনীয় (২৪) স্থানীয় সংস্কৃতি তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুমোদনীয়। (২৫) যুব কল্যান ও ক্রীড়া (২৬) জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, (২৭) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা (২৮) সরাই খানা, ডাকবাংলা বিশ্রামাগার খেলার মাঠ ইত্যাদি (২৯) মদ চোলাই, উৎপাদন ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহ। (৩০) গোরস্থান ও শ্মশান (৩১) দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার। এই খাতগুলি আপত্তিজনক নয়। (৩২) জল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা অনুমোদনীয়। (৩৩) জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও জুমিয়া পূনর্বাসন (৩৪) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাঞ্ছনীয় (৩৫) যেহেতু বিচার কেন্দ্রীয় দায়িত্বাধীন, এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও তাই, সেহেতু কারাগার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক বিষয় ভূক্ত নয়। (৩৬) পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য ছোটখাটো ও কম গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় গুলি হস্তান্তর যোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে ধারা ১ (চ) ও (৭) এ বর্ণিত বন সংক্রান্ত মৌলিক দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত। সরকারের দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিচালিত বন জাতীয় সম্পদ। ইহা স্থানীয় কর্তৃত্বে হস্তান্তর যোগ্য নয়।

দাবী ঃ ২। (ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো খুমী, খিয়াং ও চাক–এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা,

মূল্যায়ণঃ নৃতাত্বিক বিচারে ও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অবাঙ্গালী সম্প্রদায় গুলির সংখ্যা দশে সীমাবদ্ধ নয়। এদের সামগ্রিক পরিচয়ে জুমজাতি বা জুমিয়া জাতি সংজ্ঞাটির ব্যবহার ও যথার্থ নয়। এদের সবাই নির্বিবাদে জুম চাষীও নয়। জুম চাষ একটি আদিম বিলীয়মান পেশা। উহা এখন অধিকাংশ অবাঙ্গালীর দ্বারা পরিত্যক্ত। তাত্বিক অর্থে ইহারা উপজাতি ও নয়, তবে বাঙ্গালীদের সাথে ভিন্নতা দেখাতে আভিধানিক অর্থে এদের উপজাতি বলা যায়, যার অর্থ শাখা জাতি।

www.pathagar.com

জাতি শব্দটি দেশবাসী প্রতিটি নাগরিকের সামগ্রিক পরিচয়ে প্রযোজ্য। রাজনৈতিক পরিচয় জ্ঞাপনে শব্দটির ব্যবহার পৃথক রাখাই উচিত।

দাবীঃ২। (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি "বিশেষ শাসন বিধি" অনুযায়ী শাসিত হইবে, সংবিধানে এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়ণঃ যেহেতু সাংবিধানিক বাঁধার কারণে বিশেষ শাসিত অঞ্চল গঠন সম্ভব নয়, সেহেতু বিশেষ শাসন বিধির দাবী ও পরিত্যজ্য। তবে সংবিধানে বিশেষ সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর ও তা সংরক্ষণের পক্ষে সংযোজনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব।

দাবীঃ২। (গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেইরকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়নঃ ইহা সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী। এতদ সংক্রান্ত মৌলিক সংশোধনী অধিকাংশ দেশবাসীর স্বার্থের বিরোধী, তাই উহা গৃহীত হওয়া অনিশ্চিত। দেশের ভূমি সামগ্রিকভাবে জাতীয় সম্পদ। উহাতে জাতীয় অধিকার খন্ডিত করা যায় না।

দাবীঃ২। (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেই রকম আইন বিধি (Inner Line Regulation) প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

মূল্যায়ণঃ ইহা দেশের ভিতর, অঞ্চলে অঞ্চলে আভ্যন্তরিণ পাসপোর্ট ভিসা প্রবর্তণের সামিল; এবং দেশকে বহু স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করার নামান্তর।প্রস্তাবটিদুর্ভাগ্যজনক।

দাবীঃ২। (ঙ) ১। গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) যেন না করা হয় সংবিধানে সেইরকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়ণঃ (১) খন্ডিত গণভোটের প্রস্তাব অবাস্তব। জাতীয় ইচ্ছা আকাংখা ও

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। সংসদের ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব অলংঘনীয়।

দাবীঃ২। (ঙ) ২। আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেইরকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়ণঃ খন্ডিত উপজাতীয় স্বার্থের উপর সীমাবদ্ধ বিষয়াদির ব্যাপারেই মাত্র প্রস্তাবটিবিবেচ্য।

দাবীঃ২। (চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিপ্রণয়ন করা।

মূল্যায়ণঃ সশস্ত্র পুলিশ নয়, নিরস্ত্র স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন অনুমোদনীয়।

দাবীঃ২। (ছ) যুদ্ধ বা বহিঃ আক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরিণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদ্বের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেইরকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়ণঃ ইহার অর্থ–কোন অঞ্চল বিশেষ বা তার জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক পরিষদের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন। এই ব্যবস্থা শিথিল সম্পর্কযুক্ত কনফেডারেশনভুক্ত আঞ্চলিকষ্টেটের প্রাপ্য। বাংলাদেশের গঠন কাঠামো তদ্রুপ নয় বিধায় প্রস্তাবটি অগ্রহণীয়।

দাবীঃ২। (জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা–সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেইরকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগকরা।

www.pathagar.com

মূল্যায়ণঃ যেহেতু ষ্টেটের সমান ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদের প্রাপ্য নয় এবং কেন্দ্রীয় আর জাতীয় নিযুক্তি ও কর্মসংস্থানে, এতদাঞ্চলীয় লোকজনের ন্যায্য অংশ প্রাপ্য, সেহেতু এতদাঞ্চলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় স্বার্থ নিহিত। অবশ্য স্থানীয় ও পশ্চাদপদদের আসন ও পদ সংরক্ষণসহ জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্য। একচেটিয়া সুবিধাবাদ প্রবর্তিত হলে, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় নিযুক্তি ও কর্মসংস্থান থেকে এতদাঞ্চল বঞ্চিত হবে। আঞ্চলিক সুবিধাবাদের দ্বারা যা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

দাবীঃ২। (১) (ক) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

মূল্যায়ণঃ তিন জিলার দ্বারা প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের অর্থঃ কমিশনার শাসিত একটি ডিভিশন গঠন এবং রাজনৈতিক ইউনিট গঠনের অর্থঃ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত অঞ্চল বা পরিষদ। প্রথম প্রস্তাবটি অগ্রহণীয় নয়। তবে অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি স্থানীয় শাসনভিত্তিক হলে গ্রহণীয়। তবে উহা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ভিন্ন হবে না।

দাবীঃ২। (১) (খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে "জুম্মল্যান্ড" (Jummaland) নামে পরিচিত করা।

মূল্যায়ণঃ জুম একটি আদিম ও পরিত্যক্ত পেশা। অধিকাংশ উপজাতি কার্যতঃ জুম পেশায় নিয়োজিত নেই। জুমিয়া পরিচয় সুসভ্য, আধুনিক শিক্ষিত উপজাতিদের পক্ষে সময়োপযোগী ও গৌরবজনক নয়। বাঙ্গালীদের বিপরীতে পৃথক পরিচয় দানের জাত্যাতিমান থেকেই জুম্মজাতি বা জুমিয়া জাতি সংজ্ঞার সৃষ্টি এবং এই সূত্রে চট্টগ্রাম থেকে এতদাঞ্চলের ভিন্নতা দেখাবার জিদ থেকেই জুম্মল্যান্ড নামকরণের প্রস্তাব উঠেছে। ইহা চট্টগ্রাম নামের উপর থেকে এতদাঞ্চলের অধিকার ত্যাগেরও শামিল। নামটির সাথে বিদেশী ল্যান্ড শব্দ যোগ অস্বাভাবিক। তবু জুমের ঐতিহ্যকে স্থানীয় পরিচয়ের সাথে ধরে রাখা প্রয়োজনীয় বোধ হলে, প্রাচীন জুমবঙ্গ নামটির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। রাণী কালিন্দির একটি পাট্টায় এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার জুমভূমি অর্থে নামটি প্রাচীন বঙ্গীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে।

www.pathagar.com

দাবীঃ২। (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

মূল্যায়ণঃ বিশেষ বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে চালু আছে, যার দায়িত্ব হলো পার্বত্য চট্টগ্রামসহ উপজাতীয় বিষয়াদি দেখা শোনা করা। সুতরাং প্রস্তাবটি গৃহীত।

দাবীঃ২। (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষা ভাষী জুম্ম জনগণের জন্যে একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

মূল্যায়ণঃ অনুন্নত পশ্চাদপদ অশিক্ষিত সাধারণ উপজাতীয় লোকের সুবিচার পাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবটি যথার্থই প্রশংসনীয়। তবে প্রাচীন দুভাষী নিয়োগ ব্যবস্থার পূণঃ প্রবর্তনের দ্বারা ভাষাগত জটিলতা পরিহার করা সম্ভব। তার চেয়ে পৃথক ভাষাভাষী বিচারক নিয়োগ জটিল। যদি প্রস্তাবটিতে সামাজিক বিচার লক্ষ্য হয়ে থাকে তা হলে সামাজিক প্রথাও আইনকানুন সংকলিত হওয়াই উচিত, যার ভিত্তিতে সাধারণ বিচারালয়েই মামলাদির মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

দাবীঃ২। (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

মূল্যায়ণঃ সংবিধান গ্রহণকালে সংখ্যালঘু সাংসদদের সম্মিলিত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, যে ব্যবস্থাটির অন্যতম স্থপতি প্রয়াত সাংসদ মানুবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজে। এখন এই মৌলিক বিষয়টি, সাধারণ সংশোধনীর ব্যাপার নয়। গোটা জাতি ও সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত সম্মতি সাপেক্ষ। বহু উপজাতির মাঝে আসনগুলি ঘূর্ণায়মান করা ও জটিল। সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরুরা, যাতে উহার একচেটিয়া অধিকারী না হয়, তাও নিশ্চিত করার দরকার হবে। তদুপরি উপজাতিদের আঞ্চলিকভাবে নির্ধারিত সমুদয় আসনের একক দাবীদার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। স্থানীয় বাঙ্গালীরাও ন্যায়তঃ নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী। দাবীটি উগ্র সাম্প্রদায়িক না হয়ে সার্বজনিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দাবীঃ২। (৫) (ক) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area), বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

মূল্যায়ণঃ যে কারণে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় শিল্পাঞ্চল এবং অধিগ্রহণকৃত জায়গা জমি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা মান্য, সে একই কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত কর্ণফুলী হ্রদ এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় রনআইনে নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চল ও আবগারী আইনে বিশেষিত পাহাড়াঞ্চল জাতীয় সম্পত্তি। বনজ দ্রব্য ও খনিজ বস্তু গুলির উপর একারণে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে আরোপিত আংশিক সম্মতির অর্থ নীতিগত সার্বিক সম্মতি।

দাবীঃ২। (৫) (খ) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area), বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকাও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দ্দিষ্ট করা।

মূল্যায়ণঃ (ক) তে গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

দাবীঃ২। (৫) (গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মূল্যায়ণঃ পরিষদ যেহেতু স্থানীয় শাসন ভিত্তিক সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী কেন্দ্রীয় সমুদয় জাতীয় সম্পদের রক্ষক ও পরিচালক, সেহেতু ভূমি, পাহাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ গ্রহণীয় নয়।

দাবীঃ২। (৫) (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্তকৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানাস্বত্ব বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

www.pathagar.com

মূল্যায়ণঃ ইহা নাগরিক অধিকার ও বৈধ সরকারী কর্তৃত্বকে অস্বীকারমূলক অবাস্তব দাবী। তবে প্রকৃতই কোন উপজাতীয় মালিকের বন্দোবস্তিকৃত জায়গা জমি বেদখল থেকে উদ্ধার ও প্রত্যার্পণ করা যৌকিক। খাস জায়গা জমির আবাদী স্বত্ব একটি জটিল বিষয়। উহা অবাধে ও সর্বক্ষেত্রে প্রমাণ করা কঠিন হবে।

দাবীঃ২। (৫) (ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে "লীজ" (Lease) বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

মূল্যায়ণঃ ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ, এই ঐতিহাসিক দাবী উঠাতে উৎসাহিত হবে যে, মূলতঃ উপজাতিরাও অভিবাসী নাগরিক, তথা স্থানীয় নয়, বহিরাগত। সুতরাং এই অপ্রিয় বিতর্ক আর দাবী পরিত্যজ্য।

দাবীঃ২। (৫) (চ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা একটি অপ্রয়োজনীয় দাবী।

দাবীঃ৩। (১) ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানেও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

মূল্যায়ণঃ স্বদেশের প্রতিটি অঞ্চল তার নাগরিকবৃন্দের বসবাস পেশা ও ব্যবসার পক্ষে অবাধ। একমাত্র বহিরদেশীয় নাগরিকদের অনুমতিহীন অনুপ্রবেশই বেআইনী। সুতরাং দেশীয় নাগরিকদের দেশাভ্যন্তরে জমি ক্রয় বিক্রয় বন্দোবস্তি ও বসবাস আইনসিদ্ধ বৈধকাজ। এ কাজে বিধি নিষেধ আরোপ করা এবং বহিষ্কার কার্যতঃ বে-আইনী। রাজনীতির বিচারে দাবীটি উস্কানীমূলকও বটে। দেশের ৯৯·৫৫% নাগরিক এ দাবীর বিপক্ষে পরিণত হোন। মোট ০·৪৫% স্থানীয় উপজাতীয় নাগরিক মাত্র এ দাবীর সুবিধাভোগী পক্ষ। যাদের এদেশীয় মৌলিক

www.pathagar.com

নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীত নয়। সমূদয় নিরপেক্ষ ইতিহাস তাদেরকে অভিবাসী চিহ্নিত করে। যে অভিবাসন শতাব্দী দীর্ঘ আর আপত্তিহীন হলেও স্থানীয় নাগরিকত্ব মঞ্জুরের আনুষ্ঠানিকতা প্রাপ্ত নয়। কোন একজন উপজাতীয় লোকও এদেশীয় নাগরিকত্বের সনদ গ্রহণ করেন নি , যা অভিবাসীদের বৈধ বসবাসের পক্ষে একান্ত জরুরী। এ বিচারে কার্যতঃ তারা এখনো বিদেশী বংশোদ্ভুত লোক। বহিষ্কার কার্যক্রমের শিকার হওয়া তাদেরই প্রাপ্য। বাঙ্গালী বহিষ্কারের দাবী প্রত্যাহৃত না হলে, অভিবাসী বহিষ্কারের পাল্টা দাবী উঠা সম্ভব। সুতরাং এ দাবীটি অবাঞ্ছিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় আদিবাস সন্দেহপূর্ণ। আদিও প্রধান খান্দানী পেশা জুমের দ্বারাই তাদের ভূমিস্বত্ব–না থাকা ও যাযাবর লোক হওয়া প্রমানিত। ইহা রাষ্ট্রীয় সীমানাকে মান্য করেও কখনো আচরিত হয় নি। সীমান্তের এপারে ওপারে জুমিয়াদের পেশাগত বিচরণ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ দাবীটি মোটেও সুখকর নয়।

দাবীঃ ৩। (২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নর–নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠূ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মূল্যায়ণঃ পাকিস্তান আমলের কোন ঘটনার জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। সে বাস্তুত্যাগের ঘটনাটিও অসমর্থিত। ব্যাপারটি অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট।

দাবীঃ ৩। (৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের সুষ্ঠূ পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

মূল্যায়ণঃ বাঁধ নির্মাণকালেই উহার সর্বোচ্চ জলসীমার প্রভাব সমুদ্র সমতলের ১২০ ফুট উপরে নির্ধারিত হয়েছে। ঐ সীমা পর্যন্ত জমি জমা অধিগ্রহণও ক্ষতিপূরণ দান সম্পন্ন হয়েছে। এখনকার জমিও মুদ্রামূল্যের বিচারে ষাট দশক তুলনীয় নয়। নগদ ক্ষতিপূরণ, বিনামূল্যে জমি ও তার অগাধ বৃক্ষ সম্পদ দান, যাতায়াত ব্যয়, খয়রাতী চিকিৎসা, যোগাযোগ ও বাজার হাটের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। দখলীয় খাস জমি ও জুম ক্ষেত্রের ফল ফসল বাগান আর গাছ পালা ও ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্ত ছিলোনা। জমির অপ্রতুলতার দরুণ, সবাইকে পর্যাপ্ত জমি দেওয়া যায় নি । ভূমিহীন ভ্রাম্যমান ও শ্রম নির্ভর লোকজন, মালিকানা হীনতার কারণেই পূনর্বাসন লাভ

www.pathagar.com

থেকে বাদ পড়েছে এবং এদের অধিকাংশ ছিলো শ্রমজীবী বাঙ্গালী। তাই দাবীটি আংশিক বিবেচনাযোগ্য।

দাবীঃ ৩। (৪) (ক) সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (BDR) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা–সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

মূল্যায়ণঃ ইহা সার্বিক রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্ন। এতদাঞ্চল লাখেরাজ একক সম্পত্তি হিসাবে কাউকে ইজারা বা বন্দোবস্তি দেওয়া হয় নি। দেশের প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করার এ প্রস্তাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

দাবীঃ ৩। (৪) (খ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করাও সেনানিবাস স্থাপন না করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা দেশের ১০% অঞ্চল ও বিজাতি প্রলুব্ধ নাজুক সীমান্ত এলাকা। এখানে সার্বক্ষনিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে স্থায়ী সেনানিবাস থাকা জরুরী।

দাবীঃ ৪। (১) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুর্নবাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা শান্তি চুক্তি সাপেক্ষ বিবেচ্য প্রস্তাব।

দাবী ৪। (১) (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

মূল্যায়ণঃ ইহাও শান্তি চুক্তি সাপেক্ষ বিবেচ্য বিষয়।

দাবীঃ ৪। (১) (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার

www.pathagar.com

ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

মূল্যায়ণঃ শান্তি চুক্তি সাপেক্ষ বিবেচ্য বিষয়।

দাবীঃ ৪। (২) (ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

মূল্যায়ণঃ সহজেপূরনীয়।

দাবীঃ ৪। (২) (খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা লাভের সুযোগ প্রদানকরা।

মূল্যায়ণঃ ইতিমধ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত।

দাবীঃ ৪। (২) (গ) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা ইতিমধ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত।

দাবীঃ ৪। (৩) (ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা বেসরকারী তফশিলী ব্যাংক হলে অনুমোদনীয়।

দাবীঃ ৪। (৩) (খ) ভূমিহীন ও জুম্ম চাষীদের (জুমিয়া) পুর্নবাসন সহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দকরা।

মূল্যায়ণঃ ইহা ইতিমধ্যে গৃহীত ও বাস্তবায়িত সরকারী নীতি।

দাবীঃ ৪। (৩) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

মূল্যায়ণঃ ইহা গ্রহণ কঠিন নয়।

দাবীঃ ৪। (৩) (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

মূল্যায়ণঃ ইহাপূরনীয়।

www.pathagar.com

দাবীঃ৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিতে–,

১। সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নর–নারীকে বিনা শর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকিকরণ করা।

৩। জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়াদেওয়া।

৪। বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন; পাহাড় ও ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানেও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

৬। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (BDR) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক আধা–সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

মূল্যায়ণঃ

১। গ্রহনীয় তবে শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে।

২। গৃহীত ও বাস্তবায়িত।

৩। বিবেচনাসাপেক্ষ

৪। সীমাবদ্ধতা আরোপিত হতে পারে।

৫। নূতন উত্তেজনার কারণ হতে পারে, তাই শান্তির পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি, আপাততঃবর্জনীয়।

৬। ইহা বিবেচনা সাপেক্ষ দাবী নয়–বিশুদ্ধ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। উপজাতীয় স্বার্থের সাথে ইহার কোন সংশ্রব নেই। দাবীটি অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ী।

www.pathagar.com

(গ) অনুকরণীয় সাংবিধানিক নীতি নির্দেশঃ

বাংলাদেশ সংবিধানঃ

প্রথম ভাগ

অনুচ্ছেদ—১

প্রজাতন্ত্রঃ ১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।

মূল্যায়ণঃ বর্ণিত এই গঠনতন্ত্রে অধস্তন সরকারের সাম্যন্যতম সুযোগ ও সন্নিবেশিত নেই। ইহা নিজে সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভাবেই মাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আঞ্চলিক বা রাজ্য ভিত্তিক বিকেন্দ্রিকতা বা ত্রয়ী সরকারী ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা এ গঠন বিন্যাসে অস্বীকৃত হয়েছে। ইহা সংবিধানের প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধি। এই গঠনতন্ত্রের বিপরীত হলো স্বয়াত্ব শাসিত বহু অঞ্চল বা রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। অনুরূপ সংশোধন সংশ্লিষ্ট বিধিতেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে না। গোটা সংবিধানই তদ্বারা প্রভাবিত হয়। যার অর্থ হয়ঃ দীর্ঘ দিনের সাংবিধানিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষুন্ন করা। তদুপরি অনুরূপ সংশোধনীর প্রতি একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি দলীয় অভিমতই মাত্র এ পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে। ইহার অনুকূলে জাতীয় আশা অধিকাংশ এখনো প্রতিফলিত হয় নি। দাবীটি অবাঞ্ছিত বা অবৈধ কিছু না হলেও ইহা জাতীয় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত পূর্ননির্ধারন বা পাল্টানোর পক্ষে প্রবল জনমত বা জন সমর্থনের দ্বারা এখনো পরিপুষ্ট নয়। আঞ্চলিক বা দলীয় দাবীতে যথেচ্ছভাবে সাংবিধানিক বিধি বিধানের রদ বদল করা নেহাতই অবাঞ্ছিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় দাবীতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উহা স্থগিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে পর্যন্ত স্থানীয় রাজনৈতিক আকাংখা পূরণের লক্ষ্যে সাংবিধানিক ভাবেই বিকল্প পরিকল্পিত হয়েছে এবং তা-ই বর্তমানে অনুকরণীয় যথাঃ

অনুচ্ছেদ নংঃ	~~ছক অনু~~সংশোধন পূর্ব বিধানাবলী (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি)
~~১১নং~~ অনুচ্ছেদ ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে,	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

www.pathagar.com

মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্ধারিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

৩য় পরিচ্ছেদ—স্থানীয় শাসনঃ

~~৫৮নং~~ অনুচ্ছেদ ৫৯(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান —সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। | স্থানীয় শাসন

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন—সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়—সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবেঃ

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ওবাস্তবায়ন।

~~৬০নং~~ অনুচ্ছেদঃ ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পুর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন—সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় | স্থানীয়শাসন—সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

www.pathagar.com

প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুত করণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদানকরিবেন।

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত উপরোক্ত নীতিও নির্দেশের আওতায় নিম্নোদৃত সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বিশেষ সুযোগ সুবিধা মঞ্জুরাযোগ্য যথাঃ

অনুচ্ছেদঃ ১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে–এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনা নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শণকরিবেননা। | ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ইহা ভূল ধারণা যে, উপরোক্ত সাংবিধানিক নীতি ও নির্দেশ অবাধ এবং ইহার আওতায় যথেচ্ছভাবে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের স্বায়ত্ত শাসন মূলক রাজনৈতিক ইচ্ছাও আকাংখা পূরণ করা সম্ভব। সাংবিধানিক প্রস্তাবনা, প্রজাতান্ত্রিক নীতি নির্দেশ, রাষ্ট্র পরিচালনাগত মূল নীতি, এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার দ্বারা, অন্যান্য সব বিধি বিধান আবদ্ধ।

(জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং)

www.pathagar.com

পার্বত্য রাজনীতির নতুন ১৩ দফা

উপজাতীয় সশস্ত্র পক্ষের উত্থাপিত পাঁচ দফার রফা কাজ আলোচনা পর্যায়ে থাকা অবস্থায়ই শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নামে নতুন ১৩ দফা উত্থাপিত হয়েছে। এর অর্থ জটিলতাকে অব্যাহত রাখা। এতদিন জনসংহতি সমিতির একক নেতৃত্বই তার সশস্ত্র সংগঠন শান্তি বাহিনীর কঠোরতার মাধ্যমে বজায় ছিলো। এবার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। ভারত সরকার ও জনসংহতি সমিতি, শরণার্থী প্রত্যাবাসনে প্রতিশ্রুত ও চুক্তিবদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী শরণার্থী নেতৃত্ব তা আপাততঃ বানচাল করে দিয়েছে। ইহা মীমাংসার পথে নতুন পক্ষও জটিলতার সংযোগ। সুতরাং বলা যায়, জনসংহতি সমিতির একক উপজাতীয় নেতৃত্বের দাবী, এখন সুদৃঢ় অবস্থানে নিহিত নেই। মীমাংসা আলোচনায় এখন শরণার্থী নেতৃত্বের উপস্থিতি অনিবার্য। বাংলাদেশ পক্ষে সার্বিক মীমাংসাই কাম্য–আংশিক নয়। এমতাবস্থায় আসন্ন আলোচনা বৈঠক নীতিগতভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছে। তাতে হয় শরণার্থী নেতৃত্বকে আরেক পক্ষ হিসেবে শরিক করে নিতে হবে, নতুবা জনসংহতি সমিতিকে ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমিয়ে দিয়ে একক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এখানে শরণার্থী সমস্যা বা স্বার্থ পৃথক বলার অবকাশ নেই। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলনেরই ফলঃ সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও উপজাতীয়দের দেশ ত্যাগ। পাঁচ দফা ও তার পক্ষে পরিচালিত অহিংস আর সহিংস উভয় প্রকার আন্দোলনের সুফল ও কুফলের ভাগিদার সার্বিকভাবে উপজাতীয় সমাজ। শরণার্থীরা পৃথক কোন পরিস্থিতির শিকার নয়। পাঁচ দফাই চূড়ান্ত ও সার্বিক উপজাতীয় দাবী হয়ে থাকলে, তার প্রবক্তাদেরকেই ১৩ দফা রফা করার দায়িত্ব নিতে হবে। নতুনা পাঁচ দফা ও তার পক্ষে পরিচালিত আন্দোলন, গুরুত্ব হারাতে বাধ্য এবং উপজাতীয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব পন্থায় দাবী দাওয়া আদায় ও শান্তি স্থাপনে উৎসাহিত হবে। খোদ উপজাতীয় সমাজে জনংহতি সমিতি হবে অবহেলিত। উহা হবে তাদের পক্ষে সাংগঠনিক বিপর্য্যয়। আসলে ১৩ দফা জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফারই পরিপূরক কিছু দাবী। তাতে চমক আছে, বিশেষ নতুনত্ব নেই। এই দাবী প্রবণতা, বাংলাদেশ পক্ষের অতি উদারতারই ফল, যাকে বিপক্ষরদুর্বলতাভাবে।

এখানে দফাওয়ারীভাবে ১৩ দফার পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে, এটা আসলে মীমাংসাকে বাধাগ্রস্ত করা, নতুন জটিলতার সৃষ্টি ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বিরোধের সাথে এভাবে পক্ষ বৃদ্ধিকে অনুমোদন করা হলে, তা একটি প্রবণতার রূপ নিবে, এবং মীমাংসা প্রচেষ্টা দফায় দফায় প্রলম্বিত হয়েই চলবে, চূড়ান্ত হবে না।

www.pathagar.com

দফা নংঃ ১। উপজাতীয়দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান।

জবাবঃ দেশে প্রায় দশ লক্ষ উপজাতি ও আদিবাসী, জীবন ও সম্পত্তির পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করছে। কতিপয় অসন্তুষ্ট স্বদেশত্যাগী শরণার্থী ছাড়া; স্বদেশবাসী কোন উপজাতীয় বা আদিবাসী লোক নিরাপত্তা হীনতার অভিযোগে সোচ্চার নয়। স্বদেশত্যাগী শরণার্থীদের কেউ কেউ চিহ্নিত অপরাধী বিধায় তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিরাপদ নয় ভাবাই স্বাভাবিক। উপজাতীয় কেউ এ দেশের কোথাও লা-খেরাজ সম্পত্তি বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। বন্দোবস্তি দলিলের মাধ্যম ছাড়া তাদের ভূম্যাধিকার মান্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় উদারতার গুণে তাদেরকে খাস জমি ভোগ দখল করতে দেওয়ার অর্থ আনুষ্ঠানিক ভূম্যাধিকার প্রদান নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দোবস্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আবাদকৃত খাস জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় না। তবু সরকার ও জাতি উপজাতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মালিকানাধীন ও দখলাধীন সম্পত্তি বেদখল থেকে উদ্ধার ও প্রত্যার্পণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দেশে আইনের শাসন প্রচলিত আছে। কোন নিরিহ সংখ্যালঘু বা উপজাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মত অরাজক পরিস্থিতি এতদাঞ্চলে থাকা স্বীকার্য নয়। উপজাতিদের পক্ষে পরিচালিত সশস্ত্র তৎপরতার গুণে ইতিপূর্বে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি ছিলো, এখন অস্ত্র সম্বরণ পালিত হওয়ায়, তাও বিদূরিত। সুতরাং স্বদেশবাসী উপজাতীয় লোকদের জীবন ও সম্পত্তি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদই আছে। শরণার্থীদের জন্য স্বদেশে অনুরূপ নিরাপদ পরিবেশই অপেক্ষমান। ইহার ব্যতিক্রম হবে না। ইহা রাষ্ট্রীয় অঙ্গিকার, এতে আশ্বস্ত হওয়া উচিত।

দফা নংঃ ২। বিভিন্ন সময় উপজাতীয়দের উপর সংঘটিত গণ হত্যার ব্যাপারে হাইকোর্টের বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত অনুষ্ঠান।

জবাবঃ বিদ্রোহ আর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জনিত সংঘাত সংঘর্ষে, উপজাতীয় লোকদের চেয়ে বাঙ্গালীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। প্রতিটি সংঘাত সংঘর্ষ উপজাতীয় পক্ষ থেকেই শুরু হয়েছে। বাঙ্গালীরা তার পাল্টা দিয়েছে মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপজাতীয়রা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পালিয়ে গেছে। ঐ পলাতকদেরই একটি অংশ শরণার্থী হিসাবে ভারতীয় শিবিরে আশ্রিত আছে। ঐ ঘটনাবলী তদন্তে হাইকোর্টের কোন বিচারক নিযুক্ত হলে, নির্যাতিত বাঙ্গালীরাও হিসাবে আসবে। তদন্তে বাঙ্গালী পক্ষের অধিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপিত হওয়াই স্বাভাবিক। তখন তদন্তের দাবীদারেরা আবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সোচ্চার হবে। যেমনটি ঘটেছে ১৯৯১ সালের লোগাং হত্যাকান্ডের তদন্তে। সুতরাং তদন্ত দাবী, বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়।

www.pathagar.com

দফা নংঃ ৩। উপজাতীয়দের জমি ফিরত দান।

জবাবঃ সরকার তিন পার্বত্য জেলার সমুদয় জায়গা জমি জরিপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে ব্যক্তিগত মালিকানা, ভোগ দখল, বিরোধ এবং সরকারী খাসের একটি সার্বিক ও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে। উহাই হবে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা ও সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য সূত্র। সুতরাং দাবীটির যথার্থতা প্রমাণের পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। এতেও উপজাতীয় পক্ষের একদল বিরোধীতায় সোচ্চার। পর্যালোচনায় মনে হয়, শুধু একের পর এক দাবী উত্থাপন ও বিরোধীতাই যেন উপজাতীয় রাজনীতির চরিত্র। সন্তোষ, সম্মতি ও কৃতজ্ঞতা যেন তাদের কুষ্টিতে লেখা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন তাদের লাখেরাজ সম্পত্তি। বন্দোবস্তি নিতে হবে না, খাজনা সালামীও দিতে হবে না, এ দেশে আছেন, তাই তারা মহামান্য রাজা।

দফা নংঃ ৪। পার্বত্য এলাকায় মুসলিম অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

জবাবঃ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের নীতিতে ইহা পাকিস্তানের তথা মুসলমানদের প্রাপ্য অঞ্চল। স্থানীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ অমুসলিম উপজাতিরা, হিন্দুভারতের পক্ষাবলম্বী হলেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও তা দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে এতদাঞ্চলের অধিকারী। এদেশের ৮৪% লোক ধর্মতঃ মুসলমান। দেশ শাসন ও অধিকারের প্রশ্নে তারা সর্বোচ্চ অংশীদার। তবু রাষ্ট্রের উপর তারা একাধিকার প্রয়োগ করে না। ধর্মীয় আধিপত্য ও সাম্প্রদায়িকতা নয়, সহনশীলতা, সহাবস্থান ও উদারতাই তাদের আচরিতনীতি। দেশের ১০% অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। এখানে খাস সরকারী সম্পত্তির পরিমাণ আবাদী অঞ্চলের কয়েকগুণ বেশী। ঐ জাতীয় অঞ্চলে দেশের নব প্রজন্ম সহ ভূমিহীন ১০% লোকের পুর্নবাসন লাভের অধিকার অবশ্যই ন্যায্য। এই প্রশ্নে মুসলিম অমুসলিমের আপত্তি তোলা, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা চর্চারই শামিল। জাতীয় খাস সম্পত্তিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। উহা আপত্তিযোগ্য উপজাতীয় সম্পত্তি নয়।

দফা নংঃ ৫। সিভিল প্রশাসন পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম করা।

জবাবঃ বিদ্রোহীদের অস্ত্র বিরতি ঘোষণার পর থেকে পূর্ণ বেসামরিক প্রশাসন চালু আছে। ইহা অব্যাহত থাকা, বিদ্রোহীদের অস্ত্রবাজি না করার উপর নির্ভরশীল।

দফা নংঃ ৬। নিহত উপজাতীয়দের ক্ষতিপূরণ প্রদান।

জবাবঃ নিহতদের তালিকায় বাঙ্গালীদের সংখ্যাই বেশী। ঐ নিহতদের দায় দায়িত্ব

www.pathagar.com

অনেক সন্ত্রাসী শরণার্থী ও বিদ্রোহীদের উপর বর্তায়। ঘটনাগুলির সত্যাসত্য যাচাই ও দায় দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়ার পরে, শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারিত হওয়াই সঙ্গত। উপজাতিরা কি আইনের হাতে নিজেদের সোপর্দ করতে প্রস্তুত? তখন নিরাপরাধ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দাবী অবশ্যই ন্যায্য হবে।

দফা নংঃ ৭। জমি সংক্রান্ত মামলাদির একতরফা রায় বাতিল করা।

জবাবঃ ইহা সম্ভবতঃ ভুয়া অভিযোগ। তবু ইহা তদন্ত সাপেক্ষ ও মীমাংসা যোগ্য।

দফা নংঃ ৮। শান্তিবাহিনী সন্দেহে ধর পাকড় বন্ধ করা।

জবাবঃ ইহা একটি ভিত্তিহীন ঢালাও অভিযোগ। এভাবে নির্বিচারে ধর পাকড় হওয়ার ঘটনা যথার্থ তথ্যনির্ভর নয়। এখন পূর্বের ঘটনাবলীর জের টানা অনুচিত।

দফা নংঃ ৯। ধর্মান্তর করণ বন্ধ করা।

জবাবঃ এটিও একটি ভূয়া অভিযোগ। ধর্মমত প্রচার ও প্রসারে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ইসলাম সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম হলেও এতদাঞ্চলে তার প্রচার ও প্রসারে রাষ্ট্র বা সরকার কোন ভূমিকা পালন করেনা। কার্যতঃ নীরবে নিভৃতে উপজাতীয় সমাজে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারই ঘটছে। তাতে বাধা দান সরকারের কর্তব্য নয়। বরং অতীতে উপজাতিদের দ্বারা মুসলমানদের ধর্মান্তর করণেরই বহু ঘটনা ঘটেছে, যা প্রমাণিত সত্য, যথাঃ চাকমা রাজা শেরমস্ত খাঁ সহ ঐ পরিবারের পরবর্তী দশ জন রাজা ও রাণী, নাম খেতাব ও আচরণে মুসলিম পরিচিত হলেও, রাণী কালিন্দির আমল থেকে তাদের ধর্মীয় পরিচিতি নাম ও খেতাব বদলে দেওয়া হয়েছে। দাজ্যা, চেক কাবা, সর্দার, মুলিমা ইত্যাদি গোত্র ও গোষ্ঠিগুলি মূলতঃ দাড়ি রাখা খতনা করা ইত্যাদি ইসলামী আচরণ সূত্রে মুসলমানই ছিলেন, কিন্তু তাদের বংশধরগণ এখন ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ। ইসলাম ধর্ম পালনের জের হিসাবে এখনো ভগবান ও ঈশ্বরের প্রতিশব্দ হিসাবে চাকমারা 'খোদা' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানদের 'খেশ' এর প্রতিশব্দ চাকমা উপাধি খিশা, যার অর্থ আত্মীয় বা কুটুম্ব। হেজাব, সতর, কবুল, তালাক, দোজখ, সালাম ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষা চাকমা ভাষায় অঙ্গিভূত থাকায়, ইহা ভাবার অবকাশ আছে যে, বিপুল সংখ্যক মুসলিম চাকমাকে একদা ধর্মান্তরিত করার ফলেই বর্তমানে চাকমা সমাজ মুসলিম মুক্ত।

দফা নংঃ ১০। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংক থেকে গৃহীত উপজাতীয়দের ঋণ মওকুপ করা।

www.pathagar.com

জবাবঃ ইহা অর্থনৈতিক অরাজকতার শামিল দাবী। পরিমানে উহা হবে সম্ভবতঃ হাজার কোটির অংক সম্বলিত। লোট, চাঁদা ও অনুদানকে হিসাবে ধরা হলে, সাম্প্রতিক কালে বিদ্রোহী উপজাতীয় লোকেরা কয়েক হাজার কোটি টাকার সুবিধা ভোগ করেছেন। তাতে বাঙ্গালীরা হয়েছে অধিক শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। পরিস্থিতিগত কারণে লোট, চাঁদাবাজি ও সরকারী অনুদানের দ্বারা উপজাতীয় পক্ষে ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। এখন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য বাঙ্গালীদের।

দফা নংঃ ১১। উপজাতীয়দের পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনে জাতিসংঘ, রেড ক্রস, আই এলও এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের তদারকির দায়িত্ব প্রদান।

জবাবঃ বিদ্রোহীদের নিজেদের সৃষ্ট সংঘাত সংঘর্ষ জনিত বিরূপ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় উপজাতীয়দের কিছু লোক স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হয়েছে। বাংলাদেশ তাদের ন্যায্য প্রত্যাবাসনে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও তদারকি অনভিপ্রেত।

দফা নংঃ ১২। ভারতের শরণার্থী শিবিরের স্কুলে অধ্যয়নরত উপজাতীয় ছাত্রদের পরবর্তী শ্রেণীতে পরীক্ষার সুযোগ দান।

জবাবঃ ইহা সহজ সমাধ্য বিষয়।

দফা নংঃ ১৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠান ও স্থানীয় পরিষদ আইন বাতিল করা।

জবাবঃ আলোচনা অর্থবহ করার দাবী একমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষ জনসংহতি সমিতির পক্ষে উথাপন করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যদের ইহা অনধিকার চর্চা। স্থানীয় পরিষদ আর আঞ্চলিক পরিষদের ব্যাপারটা ও বর্ণিত আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এর সাতে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত নয়। প্রত্যাবাসন কার্যতঃ মানবিক বিষয়। এর সাথে রাজনীতি জড়িত করা, দুর্ভোগ বাড়ানোরই নামান্তর।

রচনাকালঃ জুলাই ১৯৯৩ ইং।

www.pathagar.com

ইতিহাস রাজনীতি ও পার্বত্য উপজাতি

আজকাল দেশে বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুল আলোচিত বিষয়। বিদ্বিষ্ট ও সশস্ত্র উপজাতিদের ক্ষোভ ও উপদ্রব, এবং ভারতে উদ্বাস্তু পরিচয়ে তাদের কিছু সাধারণ লোকের অবস্থান, স্থানীয় রাজনীতির পক্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। দীর্ঘস্থায়ী এই অনাসৃষ্টি অস্বস্তিকরও বটে। বিবদমান বাংলাদেশ ও উপজাতি পক্ষ, উভয়ই তাই এখন শান্তি স্থাপন ও সমঝোতার জন্য উদগ্রীব। সাধারণ ভুক্তভোগীরাও শান্তির জন্য ব্যাকুল। এই অনুকুল পরিবেশে, উপজাতীয় বিদ্রোহী আর বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, মীমাংসা আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। ইহা শুভ উদ্যোগ। এর সুফলের জন্য সবাই আশাবাদী এবং অপেক্ষমান।

উপজাতিদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পুরণ একটি জটিল বিষয়। সরকার প্রদত্ত শতাব্দী প্রাচীন সুযোগ সুবিধাভোগের ঐতিহ্যই তাদের উচ্চাভিলাষ পোষণের জন্য দায়ী। যদিও তখন সাধারণ লোক শ্রম দান ও দাসত্বে বাধ্য ছিলো, এবং কতিপয় সর্দার ও মাতব্বরই মাত্র শাসন ক্ষমতা ও আভিজাত্য ভোগ করেছেন। তবু উহা উপজাতীয় প্রাধান্য বলেই তাদের কাছে প্রতিভাত। জুতা পায়ে দেওয়া, অলংকার পরা, পাকা বাড়ী-ঘর তৈরী, উচ্চ শিক্ষা লাভ, উন্নত আসবাব পত্র ব্যবহার, শিকারে প্রাপ্ত প্রাণীর নিরঙ্কুশ ভোগ ইত্যাদি অভিজাতদের অনুমতির এখতিয়ারভুক্ত ছিলো। প্রথম ফসলের ভাগদান, শিকারের অংশ দান, অভিজাতদের বিবাহে উৎসবে মদ, খাদ্য শস্য ও চাঁদা দান ইত্যাদি সামাজিক বাধ্য বাধকতা সাধারণের জন্য পালনীয় ছিলো। বিচার কাজে আরোপিত ফিস ও জরিমানা সর্দার মাতব্বরদের প্রাপ্য ছিলো। সামাজিক প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বের অধিকারে অভিজাতরা সাধারণের উপর অনুরূপ দাশত্ব চাপিয়ে দিতেন। তাদের উক্ত আভ্যন্তরিন ব্যবস্থাদিতে সরকার হতেন নিরপেক্ষ। অথচ এ সব আচরণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী বিধায় এখন নিষিদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, উপজাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা (পুরাতন) দাবীর ১ (ঘ) নং ধারায় দাসত্ব মূলক প্রথা ও অভ্যাসকে চর্চার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আধুনিক যুক্তিবাদীদের পক্ষে তা সমর্থনীয় নয়। সামন্তবাদী ও

www.pathagar.com

দাশত্ব মূলক প্রথা ঐতিহ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পোষণ যোগ্য নয়। উহাতে উচ্চ নীচ মর্যাদার চর্চা হয়। ঐতিহ্য হিসেবে অতীত আকর্ষণীয় হলেও তখনকার সব আচরণ এখনকার যুগোপযোগী নয়।

সম্প্রতি সমিতির অস্ত্র বিরতি ঘোষণায় একটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে তা সংশোধিত হওয়া উচিত। বক্তব্যটি নিম্নরূপঃ

"সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার, কার্পাস চুক্তিভঙ্গ করে, ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করে নেয়, এবং স্বাধীন রাজার শাসন খর্ব করে দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।"

(সূত্রঃ অস্ত্র বিরতি ঘোষণাপত্র পৃঃ ১ তাং ১-৮-৯২)

এই বক্তব্যটির সাথে বিম্নোক্ত ধারণাগুলি জড়িত যথাঃ

১। বৃটিশ পূর্বকালে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার বলে উপজাতি পক্ষ মোগলদের সাথে একটি কার্পাস চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

২। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি, সেই স্বাধীন সার্বভৌম উপজাতীয় রাজ্য দখল করে, তা ১৮৬০ সালে বৃটিশ ভারতের অঙ্গিভূত করে।

৩। ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো উপজাতীয় রাজাদের অধীন এক স্বাধীন উপজাতীয় রাজ্য।

৪। উপজাতিগণ জুমিয়া জাতিত্বের অধীন পৃথক পরিচিতির অধিকারী।

নেহাত অপ্রিয় হলেও এ বিতর্কটি অপরিহার্য। সত্য তথ্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনিচ্ছা সত্বেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণদান আবশ্যক। উপজাতীয় আন্দোলনের যৌক্তিক শক্তি ও দুর্বলতা বুঝার পক্ষেও ইহা যাচাই করা জরুরী।

প্রথম ধারণাটি একটি অতি উৎসাহী কিংবদন্তি মূলক বক্তব্যের অংশ। বিভিন্ন উপজাতীয় পন্ডিত এ ধারণাটির উপস্থাপক; এবং উহাই জনসংহতি সমিতির এতদ সংক্রান্ত দাবীর ভিত্তি। উপজাতীয় পন্ডিতদের এক দল মনে করেন, জনৈক চাকমা রাজা ফতেহ খাঁ মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের সাথে একটি তুলা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। আরেক দলের দাবী হলো চাকমা রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁ, চট্টগ্রামের গোগল শাসক মীর হাদির সাথে ঐ চুক্তিতে উপনীত হোন। তুলা চুক্তির দাবীদার ঐ দুই পক্ষের কেহই সূত্র হিসাবে কোন সনদ বা চুক্তি পত্রের নকল উপস্থাপন করেন নি। অথচ মোগল কর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

সকল বন্দোবস্তি ও ফরমান, লিখিত দলিল বা সনদ আকারে সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের তা সরবরাহের নীতিতে যত্নশীল হতেন। এখনো সে আমলের খান্দানী পরিবারদের হাতে অনুরূপ প্রত্ন নিদর্শণ গৌরবের স্মারক হিসাবে রক্ষিত আছে। তুলা চুক্তির ব্যাপারে ইহার ব্যতিক্রম হওয়া সন্দেহ জনক। তদুপরি প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী পণ্যের পরিমাণ তুচ্ছ ১১ মনে সীমাবদ্ধ, যা ভারত সম্রাট মোগলদের পক্ষে চুক্তি যোগ্য বলে স্বীকার্য নয়।

চাক্‌মা রাজবাড়ীতে রক্ষিত সীল মোহরের তালিকায় রাজা ফতেহ খাঁর সীল মোহরটিরও আছে। আরবী বর্ণে খোদাইকৃত ঐ সীল মোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর কার্যকাল ১৭৭১ খ্রীঃ সালে শুরু হয়েছে বলে নির্ণীত হয়। মোগল আমলের ইতিহাস বলে, মোগল রাজ পুত্র খররুখ শিয়ার ১৭১৩ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত রাজমহলে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। তার দাদা ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে, সিংহাসন দখলের পারিবারিক অন্তর কহ্‌লের এক পর্যায়ে যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি রাজধানী দিল্লী দখল করেন, এবং ঐ বৎসরই সম্রাট ঘোষিত হোন। ১৭১৯ খ্রীঃ সালে বিষ প্রয়োগে তিনি নিহত হলে, তদীয় পিতৃব্য পুত্র মোহাম্মদ শাহ রাজ পদ লাভ করেন। সুতরাং বৃটিশ আমলের লোক ফতেহ খাঁর পক্ষে ঐ মোগল সম্রাটদের সাক্ষাৎ লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বর্ণিত ফতেহ খাঁ সম্বন্ধে আরেকটি বিভ্রান্তি হলোঃ চাকমা-রাজ-কিংবদন্তিতে তাকে ঐ বংশেরই শের মস্ত খাঁ রহমত খাঁ ও শেরজান খাঁর পিতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।, এবং বলা হয়েছে তিনি রাজা জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী চাকমা রাজা। অথচ প্রখ্যাত পন্ডিত ও ঐতিহাসিক ডঃ এ, এম, সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ "অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস" এ অকাট্য ভাবে প্রমান করেছেন; দক্ষিণ চট্টগ্রামের পৃথক সামন্ত পরিবার চন্দন খাঁ বংশের শেষ ব্যক্তি ছিলেন ঐ জালাল খাঁ। তার কার্যকাল ছিলো ১৭১৫-২৪ খ্রীঃ এই দশ বৎসর। অবাধ্যতার কারণে তিনি মোগল কির্তৃক বিতাড়িত হোন এবং আরাকানে মৃত্যুবরণ করেন। ইহার ১৩ বৎসর পরে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে আরেক স্বদেশ ত্যাগী আরাকানী অভিজাত যাকে শের মস্ত খাঁ ও আদি চাকমা রাজা বলে অভিহিত করা হয়, কিছু সঙ্গী সাথীসহ চট্টগ্রামে আসেন ও তথাকার মোগল শাসক জুলকদর খানের আনুকুল্যে কোদালা উপত্যকায় কিছু পতিত খাস পাহাড়ী জমি ও পূর্বাঞ্চলবাসী পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম খাজনা আদায়ের তহসীলদারী লাভ করেন। সুতরাং অর্বাচীন ফতেহ খাঁর পক্ষে ঐ শের মস্ত খাঁর পিতা হওয়া আর তিনি চন্দন খাঁ বংশের সাথে ঐ শের মস্ত খাঁর বংশীয় সম্পর্ক রচনার যোগসূত্র এ দাবী করা সঠিক বলে প্রমানিত হয় না। ফতেহ

www.pathagar.com

খাঁ হলেন পুত্র রূপে কথিত শের মস্ত খাঁর স্ববংশীয় অধঃস্তন পুরুষ। রাজ কিংবদন্তি অনুযায়ী সাথুয়া রাজার পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁ, এবং রাজা মোগল্যার পুত্র জুবাল খাঁ ও ফতেহ খাঁ। অথচ বর্ণিত অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের প্রদত্ত তথ্য মতে চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ, পরস্পর সম্পর্কে সহোদর ভাই নন, পিতা পুত্র। রতন খাঁর পুত্র কাট্যুয়াই জালাল খাঁর পিতা 'এই সূত্রে সহোদর ভাই হিসাবে ফতেহ খাঁর পক্ষে জালাল খাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সমর্থিত হয় না। এই অসঙ্গতি গুলি আলোচ্য ধারণাটির বিভ্রান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তদুপরি অতিরিক্ত একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ মুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত ঐ অভিজাতদের অমুসলিম চাকমা হওয়া কি নিশ্চিত? এর অনুকূলে প্রমান কোথায়? শুধু ভাবাবেগই তো ইতিহাস নয়। যদি বলা হয়; তারা প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন, এবং চাকমারা ছিলেন তাঁদের প্রজা তাহলে সপ্রমাণ জবাব কী হবে?

এই প্রশ্নে উপজাতীয় মহলের চিরাচরিত জবাব হলোঃ ঐ মুসলিম নামকরণ প্রাচীন আমলের মুসলিম সমাজও শাহী প্রভাবেরই ফল। কিন্তু ইহারও জবাব হলোঃ চন্দন খাঁ বংশের সময় কাল ১৭১১-২৪ এই তের বৎসর অবশ্যই মুসলিম প্রভাবিত আমল, কিন্তু তাদের চাকমা রাজ বংশভুক্ত হওয়া প্রমানিত নয়। আদি চাক্মা রাজ শের মস্ত খাঁর বংশের সোনা বি ও শের জব্বার খাঁ সহ এই তিন পুরুষই মাত্র মোগল আমলের লোক, যাদের সময়কাল ১৭৩৭-৬৫ এই ২৮ বৎসরকালে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাদের জন্মস্থান ও আদি বাসস্থান ছিলো আরাকানের রোসাং। ইহা চাকমা লোকগীতি ও শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের দ্বারা প্রমানিত। এমতাবস্থায় তাদের শৈশবের নামকরণ স্থান মুসলিম প্রভাব মুক্ত ছিলো বলেই ভাবা যায়। পরবর্তী সাতজন মুসলিম নামধারী রাজা মূলতঃ মুসলিম প্রভাবমুক্ত বৃটিশ আমলেরই লোক। তাদের মুসলিম নামকরণে সে প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য নয়।

বাদশাহী আমলের প্রতিষ্ঠিত রীতি মোতাবেক মুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদেরই খান, খান সাহেব, খান বাহাদুর, ও নবাব খেতাব প্রাপ্য ছিলো। কদাচিত অমুসলিম শাহী আত্মীয়দের ঐ খেতাবে ভূষিত করা হতো। তৎসঙ্গে অমুসলিম সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত ছিলো রায়, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, রাজা, রাজা সাহেব, রাজা বাহাদুর, ও মহারাজ খেতাবগুলি। কদাচিত কোন মুসলিম অভিজাত অমুসলিম পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যের অনুসরণে রাজা সাহেব সম্বোধিত হতেন। এই খেতাবের বিচারে ও চাকমা রাজ পুরষগণ অমুসলিম বিবেচিত হোন না। এর অনুকূলে আরো প্রমান হলো; রাজ মহিষীগণ বিবি, আর রাজাগণের প্রতি হুজুর সম্বোধন আরোপ, এবং তাদের খাটি মোগলাই সাজ পোষাক ও আড়ম্বর যা বাংলা অঞ্চলের

www.pathagar.com

অমুসলিম রীতি বিরুদ্ধ। সর্বোপরি বিস্ময়কর ভাবে চাকমা ভাষা ও আচার আচরণের অনেকাংশ খাঁটি মুসলিম চরিত্র সম্পন্নও বটে। ইহা এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয় যে, একদা একদল চাকমা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

দ্বিতীয় ধারণাটি মনগড়া ইতিহাস প্রসূত। ইহার অনুকূলে উপজাতীয় পক্ষ কোন গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনে কখনো সক্ষম হবেন না। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হলোঃ নবাব মীর কাসীম আলী খাঁন, ১৭৬১ খ্রীঃ সালে এক ফরমান বলে এ দেশীয় প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ পরগনা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসন ও রাজস্বের দায়িত্ব বৃটিশদের নিকট অর্পণ করেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক রেজা খান, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ হেরি ভেরেলষ্টের নিকট ৫ই জানুয়ারী তারিখে দায় দায়িত্ব হিস্তান্তর করেন। তখন চট্টগ্রামের সীমানা ছিলো উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফনদী, ও পূর্বে ঠেকা নদী হয়ে চীন পাহাড় শ্রেণী। পার্বত্য চট্টগ্রাম নামীয় কোন পৃথক ভূভাগ তখন ছিলো না। কুকি ও পূর্বের মুক্তাঞ্চল বাসী অরাজক উপজাতিদের উৎপাত ও আক্রমণ ঠেকাবার প্রয়োজনে রেইড অফ ফ্রান্টিয়ার টাইবস নামীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় ১৮৬০ খ্রীঃ সালে এতদাঞ্চলকে পৃথক করা হয়। সুতরাং ইহা সঠিক তথ্য নয় যে, ১৮৬০ খ্রীঃ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব ছিলো, এবং উহা ছিলো বৃটিশ প্রশাসনের বহির্ভূতঃ মুক্তাঞ্চল।

তৃতীয় ধারণাটি তথ্যের বিচারে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এতদাঞ্চলে কোন উপজাতীয় স্বাধীন রাজ্য ও রাজত্ব থাকা সমসাময়িক ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত নয়। ঐ রাজ্যের নিজস্ব ইতিহাসটি ও প্রদর্শন যোগ্য নয়। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা আরাকান মোগল ও পাঠান শক্তির সাথে, তাদের কোন সংঘাত সংঘর্ষ বা সম্পর্কের কথাও কোন বিবরণে প্রাপ্তব্য নয়। নিজস্ব মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ কীর্তি সনদ ইত্যাদি এবং রাজকীয় প্রত্ন বস্তু বা দলিল জাতীয় কিছু পুরা বস্তু ইত্যাদিও পাওয়া যায় নি। সুতরাং স্বাধীন রাজা রাজ্য ও রাজত্ব থাকার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? রূপ কথার কল্প কাহিনীভুক্ত রাজা রাজ্য ও রাজত্বকে বাস্তবে প্রমান করা কঠিন।

উপজাতীয় পন্ডিত মহল বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপণে ব্যর্থ হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় কিছু বক্তব্যকে অবলম্বন করে আছেন। আসলে ঐ বক্তব্যগুলির সুবিধাজনক অংশগুলি আংশিক উদৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের দাবীকৃত কল্প রাজ্যকে সপ্রমাণে সচেষ্ট। কিন্তু ঐ বক্তব্যগুলি সামগ্রিক ভাবে আত্ম বিশ্লেষিত নেতিবাচক তথ্যই দান করে। ভুল ভাঙ্গার জন্য ঐ বক্তব্য গুলি সামগ্রিক ভাবে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হলো। যথাঃ

www.pathagar.com

১। The Rajas of the Chitttagong Hill Tracts were originally appointed by the suffrage of the Jhoomias, Kukees and other inhabitants and not by the sovereign of the Country as usual, They were all indipendently paid no tribute or revenue to the Moghal Government Untill the Moghee year 1077 ms 1715 AD.

(Ref: Revenue letter no 1499, 10th September 1866 addressed to the Commissoner Chittagong)

রাংলাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাগণ স্বাভাবিক ভাবে দেশীয় কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হোন নি, তারা মুলতঃ জুমিয়া কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের সম্মতিতেই রাজা অভিহিত। তাদের কেহই ১০৭৭ মঘী সন মোতাবেক ১৭১৫ খ্রীঃ সালের আগে স্বেচ্ছায় মোগল সরকারকে কোন রকম খাজনা বা কর দিতেন না। (সুত্র চট্টগ্রামের কমিশনারকে লিখিত রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ।)

এ বক্তব্যের তাৎপর্য ইহাই হওয়া সম্ভব যে, তাদের স্থানীয় নাগরিত্ব ক্ষমতা ও ভূম্যাধিকারের পতি মোগল সরকারের অনুমোদন বা স্বীকৃতি ছিলো না। বাস্তবে তারা ছিলেন ভূমি স্বত্বহীন যাযাবর জুমিয়া।

২। In 1763 Ac verelst the English Chief of Chittagong and his Council by proclamation declared the local jurisdiction of the Raja to be all the hills from phani rever to sungu and from Nijampur Road to hills of Kukee Raja, (Ref Chitttagiong Hill Tracts Gagetter by KHS Hutchinson page 24)

বাংলাঃ ১৭৬৩ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের ইংলিশ প্রধান ভেরেলষ্ট ও তার পরিষদ ফরমান জারি করে ঘোষণা করেন যে, রাজার স্থানীয় এখতিয়ার হবে ফেনী নদী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমুদয় পর্বতাঞ্চল।

(সুত্রঃ মিঃ কেএইচএস, হাচিনসনকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের গেজেটিয়ার পৃষ্ঠাঃ ২৪)

৩। Mr, Hery verelst Chief of the Chittagong council of the period declared that, it had been proved to his

www.pathagar.com

satisfection that, all the hills from phanny to the sungoo and from the Nijampur Road to the hills of the Kukee Rajah pertained to the Zamindary of Raja Sher Most Khan, in the Kapas Mohal Department, and directed that he should continue in posasion there of paying the revenues of the Government and prohibited the sub orinate officers from interfering with him, his heirs and successors in this holding

(Ref Letter to Kalindi Rani by Mr, A Smith the Collector of Chittagiong dated the 2nd January 1866)

বাংলাঃ মিঃ হেরি ভেরেলষ্ট তখনকার চট্টগ্রাম পরিষদের প্রধান ঘোষণা করেন; ইহা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ভাবে প্রমানিত যে, ফেনী থেকে শঙ্খ এবং নিজামপুর সড়ক থেকে কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত সমুদয় পর্বতাঞ্চল, যা কার্পাস মহাল নামীয় বিভাগের অধীন, উহা রাজ্য শের মস্ত খাঁর জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত। তিনি ইহা ও আদেশ করেন যে, সরকারের প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করার দ্বারা ইহাতে তিনি অব্যাহত ভাবে অধিকারী থাকবেন। এবং সব অধঃস্তন কর্মকর্তাদের তার উপর তার ওয়ারিশান ও উত্তরাধিকারীদের উপর উক্ত সত্বের ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করা থেকেও বারণ করেন। (সুত্রঃ চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ এ স্মিত কর্তৃক কালিন্দিরানীর নিকট লিখিত চিঠি তাং-২রা জানুয়ারী ১৮৬৬)।

চিঠিতে বর্ণিত জমিদারীর অর্থ জুম তহসীলদারী যা চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুল কদর খান কর্তৃক রাজা শের মস্ত খানকে প্রদত্ত হয়েছিলো। বাস্তবে মিঃ ভেরেলষ্টের সময় শের মস্ত খান জীবিত ছিলেন না।

৪। In 1829 Mr. Halhead the Commissioner stated that, the hill tribes were not British subjects, but merely, tributoreis, and that we recognised, no right on our part to interfere with their internal arrangement.

(Ref: Statistical Account of Bangal Vol vi page 22 by w, w, Hunter)

বাংলাঃ ১৮২৯ সালে কমিশনার মিঃ হলহেড বলেন, পাহাড়ী উপজাতিগণ বৃটিশ প্রজা নয় বড়জোর করদাতা। এ কারণে আমাদের পক্ষে তাদের আভ্যন্তরিন ব্যবস্থাদিতে হস্তক্ষেপ করা অনুমোদনীয় নয়।

www.pathagar.com

(সূত্রঃ ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গল, খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ২২ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারা)

এই বক্তব্যটি ভিন্ন তথ্য জ্ঞাপক। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন আরাকানী উদ্বাস্তুতে ভর্তি ছিলো। বর্তমানের অধিকাংশ উপজাতি সেই তাদেরই বংশধর। তখনো ১/১৯০০ সালের আইনের ৫২ ধারায় মঞ্জুরকৃত ইমিগ্রেশন বা অভিবাসনের মত আইনগত সুবিধা প্রচলিত ছিলো না। তাই এতদাঞ্চলীয় অধিকাংশ উপজাতি বিদেশী ও বিজাতি হিসাবে গণ্য ছিলো। স্থানীয় নাগরিক না হওয়ার দরুণ তাদের বৃটিশ প্রজা না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়ে অভ্যস্ত পেশা জুম চাষে তারা লিপ্ত হতো। যদ্দরুণ প্রচলিত রাজস্বনিয়মে তাদের কর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। ১৮২৪ খ্রীঃ সালের প্রথম বৃটিশ বার্মা যুদ্ধ, বৃটিশদের আরাকান দখল এবং তৎপূর্বে ১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভারাজ্য কর্তৃক আরাকান দখল ইত্যাদি জনিত কার্যকারণ ও প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস পাঠে এতদ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য অবগত হওয়া যায়।

উপজাতীয় রাজা রাজ্য ও রাজত্বের কথা বাস্তবেও একটি আত্ম ভুলানো রূপ কথা। ভারতে বৃটিশ দখল সম্প্রসারণ ও তাদের দীর্ঘ শাসনের ইতিহাস সবিস্তারে লিখিত আছে। তাদের হাতে অতীতে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র উপজাতীয় রাজ্যের পতনের কথা কোন বিবরণেই প্রাপ্তব্য নয়। অবশ্য ১৭৭৬–৮৬ এই দশ বৎসর স্থায়ী একটি চাকমা বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়া সরকারী রেকর্ডপত্রে স্বীকৃত। তখন বিদ্রোহী পক্ষ নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিপক্ষ ঘোষণা করেন নি। বিদ্রোহী চাকমা রাজা জান বখশ খাঁ, স্বীয় সীল মোহরে নিজেকে মহারাজ তথা সামন্ত অধিপতি দাবী করেছেন। রাণী কালিন্দিও নিজের জমিদার দাবীতে সোচ্চার ছিলেন, যা কার্যতঃ বৃটিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। খোদ কালিন্দি রাণী রাজ্য নগরের পরিত্যক্ত রাজবাড়ীর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখিত ভাবে স্বীকার করেছেনঃ চাকমাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শের মস্ত খাঁ। চাকমা লোকগীতি অনুযায়ী যার আদি বাসস্থান আরাকানের রোয়াং বা রোসাং। নির্ভূল তথ্যের ভিত্তিতে তার আগমন কাল হলো ১৭৩৭ সাল। রাজা শের জব্বার খাঁর সীল মোহরের ভাষ্য অনুযায়ী তিনিও স্বীয় সর্দারী কালে (১৭৪৯–৬৫) আরাকানের রোসাং বাসী ছিলেন। সুতরাং বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত চাকমাগণের সদল বলে আরাকানে থাকাই সমর্থিত হয়। শের মস্ত খাঁর মাধ্যমে তাদের কিছু লোকের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ ছাড়া রাজ্য শক্তির অধিকারী হওয়া আজ–গৌবী তথ্য। তবু কিছু বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় উক্তি স্বাধীনতার প্রমান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যা বাস্তবে ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে সেই ১৭৭৬–৮৬ সালের

www.pathagar.com

বিদ্রোহটি হলো আসলে ভারত ব্যাপী বৃটিশ বিরোধীতারই অংশ। বাংলায় তখন ফকির সন্যাসীদের বিদ্রোহ চলছিলো। ঘটনার সূত্রে জানা যায়, চাকমা বিদ্রোহের সাথে একদল কুকি এবং জনৈক মুন গাজির নেতৃত্বে একদল বাঙ্গালীও যুক্ত ছিলেন। সুতরাং উহা চাকমা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হওয়া সন্দেহ জনক। তবে বাস্তবে পাওয়া না গেলেও, কল্প কাহিনীতে চাকমা রাজা রাজ্য ও রাজত্ব বিদ্যমান। রাধা মোহন ধনপতি গীতিমালাটি সে কাহিনীর যোগানদার। কার্যতঃ এটিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং নামে হুবহু আরেকটি কাহিনী আরাকানেও প্রচলিত আছে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে দান্যাওয়াদি আরেদ ফুং হলো ধনপতি বা ধনবতী রাধা মোহনের আরাকানী ভাষ্য। পার্থক্য শুধু নাম শব্দ প্রয়োগের মাঝেই সীমাবদ্ধ। চাকমা কাহিনীতে রাধা মোহন আগে স্থান পেয়েছে, আর আরাকানী কাহিনীতে পরে। মৌলিকত্বের বিচারে কোনটি আসল আর কোনটি নকল, নির্ধারণ করাও মুশকিল। কাহিনীটি অতিরঞ্জন ও বাস্তবতা মিশ্রিত। তাতে অনুমান করা যায়; সুদূর অতীতে একদা কোথাও চাকমা সম্প্রদায়ের কিছু সামন্তীয় আধিপত্য ছিলো। কাহিনীটি উহারই স্মৃতি কথা।

মোগল আমল ও বৃটিশ আমলের প্রামান্য ঐতিহাসিক উপাদান এবং কর্তৃপক্ষীয় বক্তব্যের বিষদ ও সামগ্রিক বিবরণের দ্বারা অকাট্য ভাবে ইহা প্রমানিত হয় যে অতীতে চাকমা বা অন্য কোন উপজাতির পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাজত্ব ছিলো না। এতদাঞ্চলে চাকমা আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুলকদর খান, যিনি তাদের অভিবাসন, জমি বন্দোবস্তি ও জুম খাজনার তহসীলদারী মঞ্জুর করেন। তবে সার্বভৌম রাজ্য ও রাজত্বের অধিকারী না হলেও তিন উপজাতীয় রাজ পরিবার ঈর্ষনীয় প্রাচীন কৌলিন্যের অধিকারী এবং তাদের সম্প্রদায় গুলি ও গৌরব জনক অতীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। শুধু বাংলাদেশেই তাদের কয়েক শতাব্দীর কৌলিন্য বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত গৌরব জনক উত্তরাধিকার।

উপজাতি পক্ষে চতুর্থ বা শেষ ধারণাটি ও সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসুত। উপজাতীয় বা জুমিয়া জাতিত্বের অস্তিত্ব এতদাঞ্চলে কখনো ছিলো না। তাদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যা, জনসংহতি সমিতির হিসাব অনুযায়ী দশ, স্থানীয় সরকার পরিষদের স্বীকৃতি মূলে পনর, বিদেশী নৃতাত্বিক পন্ডিতদের হিসাব মতে দশ থেকে পনের এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমষ্টিগতভাবে আট ও সম্প্রদায়গতভাবে চব্বিশ। এই সংখ্যাধিক্যের মত নিজস্ব আশা আকাঙ্খা, ভাষা ও আচরণেও সবাই ভিন্ন। বাংলা ভাষাই তাদের পারস্পরিক ভাব আদান প্রদানের প্রধান মাধ্যম। একমাত্র জুম পেশাই তাদের ঐক্য ও অভিন্নতার সূত্র, যে পেশাটি

www.pathagar.com

আজকাল বিলীয়মান। ইহা আদিমতার শেষ অবলম্বন। উপজাতিদের সবাই এই পেশায় জড়িত নেই। জুমিয়া পরিচয়টি আধুনিক ভদ্র ও শিক্ষিত লোকদের রুচি ও মানের সাথেও সঙ্গতিশীল নয়। বাঙ্গালীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হুজুগের বশে, এই অনুপযোগী ধারণাটির চর্চা হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনায় ইহাই প্রমানিত হয় যে, উপাজাতীয় রাজনীতি দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বাঙ্গালীদের সাথে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। বাঙ্গালীদের এক বৎসরের জীবিত নব প্রজন্মের সংখ্যা কম হলেও পঁচিশ লক্ষ। অস্ত্রবাজির রক্তপাত ও প্রাণহানিতে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি দুর্দমনীয়। এর প্রমান হলো উপদ্রবের মাঝেও এতদাঞ্চলে তাদের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটা। সুতরাং বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রণে হিংসা আর অস্ত্রবাজি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখন সাফল্যের যে একমাত্র উপায়টি অবশিষ্ট আছে তা হলো সদিচ্ছা ও সহানুভূতি আকর্ষণ। উপজাতীয় অস্তিত্ব ও বৈচিত্রকে বাঁচাতে আবেদন সৃষ্টি করা। সন্দেহ নেই শান্তির প্রতি জনসংহতি সমিতির আগ্রহ, একটি প্রসংশনীয় ঐতিহাসিক উদ্যোগ। সর্বোচ্চ আশার কথা যে, তারা দাবী দাওয়ার পরিধি সংকুচিত করে, এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের মাঝেই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। সব উগ্রতা আর বাড়াবাড়ি স্থগিত হয়েছে। ইহা সদিচ্ছার বহির প্রকাশ। এখন এই সীমিত দাবী দাওয়া অপুরণীয় নয়। নিম্নোক্ত বক্তব্যটিতে তাদের সংশোধিত নীতি আদর্শই ব্যক্ত হয়েছে, যাকে স্বাগত জানান দরকার, যথাঃ

"জুম্ম জনগণ আজ সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করে, নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে বদ্ধ পরিকর। জুম্ম জনগণের এই আন্দোলন অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন। এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি জাতীয় পরিচিতি, জন্মভূমি ও ভিটামাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে জুম্ম জনগণ, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতিদ্রুত গতিতে অবসান করে সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মক ভাবে সামিল হতে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, সংহতি, সামাজিক সংগঠন অভ্যাস, প্রথা, প্রবাদ ভাষা, ঐতিহ্য ভূমির

www.pathagar.com

অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না। (সূত্রঃ জনসংহতি সমিতির জরুরী বিজ্ঞপ্তি পৃঃ ৪ তাং ৩১-১০-৯১ খ্রীঃ)।

অতি সুসংহত ও বিজ্ঞ মনোভাব সম্বলিত এই বিবৃতি মীমাংসার সম্ভাবনাকে একেবারে দ্বার গোড়ায় এনে দিয়েছে। বিদ্রোহী পক্ষের ইহা চূড়ান্ত ছাড়। এর ভিতর অপুরণীয় বা আপত্তি জনক কিছুই নেই। গণতন্ত্র আর দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের মান্যতাই মীমাংসার চূড়ান্ত সূত্র। বিদ্রোগী পক্ষের ইহা আশাতীয় নমনীয়তা।

কী কারণে উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ, আর কেনই বা তারা সশস্ত্র আন্দোলনে বাধ্য, শান্তির স্বার্থে তা খুঁজে দেখা দরকার। এই লক্ষ্যে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, সুচিত আন্দোলনের ভিতরকার দর্শনটি কী? উপজাতিদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা সম্বলিত দাবী নামায় নিম্নাকারে উহা উপস্থাপন করেছেন। যা এখানে আলোচিত হলো। যথাঃ

১। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বোম, লুসাই, মুরুং, পাংখো, রিয়াং ও চাক এই দশটি ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। (সামান্য পরিবর্তিত)।

২। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে রচিত প্রথম শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে স্বীকৃত। পাকিস্তানের ১৯৬২ সালে রচিত দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে এতদাঞ্চল উপজাতীয় অঞ্চল রূপে ঘোষিত। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে ঐ দুই প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা লংঘিত হয়েছে, যা জুমিয়া জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আর ভুমি সত্ব সংরক্ষনের পরিপন্থী। (সংক্ষিপ্ত)

৩। জুমিয়া জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের উপায় হলো গণতন্ত্র সম্মত স্বায়ত্ব শাসন। দেশ রক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক মুদ্রা ও ভারি শিল্প ইত্যাদি বাদে সমুদয় বিষয়াবলী হবে উহার এখতিয়াধীন। সে সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে। বহিরাঞ্চল বাসীদের ভূমি ক্রয় বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্তি গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে। ১৭ই আগষ্ট ১৭৪৭ এর পর থেকে এ যাবৎ আগত বহিরাগতদের প্রত্যাহার ও স্বদেশ ত্যাগী উপজাতীয়দের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগ ও বদলীতে স্থানীয় এখতিয়ার হবে নিরঙ্কুশ। বহিরাঞ্চলবাসীদের প্রবেশ ও ভ্রমণ হবে অনুমতি সাপেক্ষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম হবে জুম্ম ল্যান্ড।

এই হলো উপজাতি পক্ষের মোটামুটি রাজনৈতিক দর্শন। এখন এর তথ্য ভিত্তিক যথার্থতা ও বাস্তব পরিস্থিতিজাত পরিবেশ যাচাই করা হলে উভয় পক্ষের

www.pathagar.com

যুক্তিবাদীদের বিষয়টি বুঝতে ও তার ভুল ত্রুটি নিরুপণ করতে সহায়তা হবে। বিবদমান পক্ষদের মীমাংসায় পৌছতে অনুরুপ বিশ্লেষণ মুলক আলোচনার দরকার।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, উপরোল্লিখিত উপজাতিগণ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। কিন্তু ইহা তাদের আদি আবাসভূমি নয়। জনসংহতি সমিতি এতদাঞ্চলকে উপজাতিদের আদি জাতীয় আবাসভূমি জ্ঞানে এতদাঞ্চলে তাদের ভূমি স্বত্ব আর একাধিপত্য সংরক্ষণের দাবীদার। আসলে ইহা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের আগমণ নির্গমন চিহ্নিত আছে। এদের অধিকাংশই বহিরাগত উদ্বাস্তুদের বংশ ধর। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারার সুবিধা বলে, এরা এতদাঞ্চলের অধিবাসী নাগরিক, মুল অধিবাসী নয়। সংখ্যায়ও তারা দশনয়, বেশী। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য বাধ্যতামূলক পালনীয় নয়। সে সবের অপ্রয়োজনীয় আর অবাঞ্ছিত বিধি বিধান, পালনীয় নয় বলেই নতুন আইনের দ্বারা তা বর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর গণতন্ত্রের মানে হলো যুগোপযোগী নিজস্ব ইচ্ছা আকাঙ্খা ও ক্ষমতার প্রয়োগ, পশ্চাদপদতাকে আকড়ে ধরা নয়। ১/১৯০০ সালের শাসন বিধি উপজাতীয়দের শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্ম সংস্থান যোগাযোগ স্বশাসন ইত্যাদি কোন সুযোগ সুবিধাই প্রদান করে নি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিলো ঔপনিবেশিক বিধি ব্যবস্থা। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রগুলি পূর্বাঞ্চলের আশা আকাঙ্খা পুরণের উপযোগী ছিলো না। বাংলাদেশ সংবিধান গ্রহণে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা খোদ শরীক ছিলেন। তিনি তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন তথা ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করেন নি। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তার দাবী উঠালেও জাতীয় পরিষদে এতদাঞ্চলের পৃথক শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ও উপজাতীয় অঞ্চলের স্বীকৃতি আদায়ের দাবীতে সোচ্চার ছিলেন না। এখন এ বিষয় গুলি সাংবিধানিক জটিলতায় আবদ্ধ। এখন আর এ সবের সহজ সমাধান নেই। হলেও সময় সাপেক্ষ। যুক্তি, গণতন্ত্র স্বাধীনতাও আধুনিকতার বিচারে আসলে ১/১৯০০ সালের শাসন বিধি একটি জংলী আইন। তাতে তিন উপজাতি প্রধান তিনশত তেহাত্তর জন মৌজা প্রধান ও শতাধিক বাজার চৌধুরীকে কুলিন, প্রশাসনের খয়ের খা, তাবেদার ও একাধারে সাধারণ লোকদের প্রভুতে পরিণত করা হয়েছে। সাধারণ লোক ঐ অভিজাত্ আর সরকারী কর্মকর্তাদের শ্রম দানেও বাধ্য। ঐ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারা কার্যতঃ স্বদেশবাসী কারো আগমন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে না। বিদেশী বিতাড়নই উহার লক্ষ্য। অভিবাসী উপজাতিগণ ও তা থেকে মুক্ত নন। কিন্তু অতীতে ইহার অপপ্রয়োগ হয়েছে। ঔপনিবেশিক স্বার্থে বহিরাগত উপজাতিরা আনুকুল্য পেয়েছেন। অভিবাসী হওয়ার পরিচয় তবু তাতেও ঘোচে নি। স্বাধীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ঐ বৃটিশ প্রবর্তিত ঐতিহ্যকে মেনে নিতে বাধ্য নন। কিছু ঐতিহ্য না ভাঙ্গা একটি উদারতা মাত্র। ভূমি স্বত্ব না পাওয়ার জন্য উপজাতিদের জুম চাষ ও বন্দোবস্তি গ্রহণের অনীহাই দায়ী। ইহা কোন আইনেই উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি নয়। কোন কর্তৃপক্ষই পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতিদের লাখেরাজ সম্পত্তি হিসাবে বন্দোবস্তি বা ঘোষণা দেন নি । সুতরাং বিনা বন্দোবস্তিতে ভূমির মালিকানা লাভ বিধি বদ্ধ না থাকায়, সরকারী সদিচ্ছা থাকা সত্বেও তাদের অধিকাংশের ভূমি স্বত্ব অর্জিত হয় নি। এর জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। এখন ভূমি স্বত্ব সংরক্ষণের দাবী অবাস্তব। স্বাভাবিক নিয়মে বন্দোবস্তি গ্রহণ অবাধ। দখলীয় বা আবাদী জায়গা জমি খাস রেখে মালিকানা প্রতিষ্ঠা বিধি সম্মত নয়। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন শিক্ষিত ভদ্র লোকের জুমিয়া পরিচয় মর্যাদা সম্পন্ন নয়। গণতন্ত্র কখনো পশ্চাদপদতা, আদিমতা সংরক্ষণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা আঞ্চলিকতা গোষ্ঠী প্রীতি ও কুপমন্ডুকতাকে সমর্থন করে না। গণতন্ত্র স্বাধীন উদার ও সার্বজনিন কল্যাণের ধারণা। সংকীর্নতা ও সুবিধাবাদ তাতে সমর্থিত নয়। এই গণতন্ত্র এখন সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গোটা জাতীয় জনমত পুনরায় ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে গঠিত হওয়া সাপেক্ষে প্রাদেশিক ধরণের স্বায়ত্ব শাসন লাভের আকাঙ্খা এখন স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। তবে স্থানীয় বা আঞ্চলিক শাসনের প্রশ্ন মীমাংসা যোগ্য। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক আকাঙখা পূরণের বিকল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব।

বাঙ্গালীদের বেআইনী বহিরাগত বলা, তাদের বৈধ সহায় সম্পত্তিকে আইনানুগ স্বীকার না করা, নির্বিচারে তাদের সবার প্রত্যাহার দাবী, পাকিস্তান আমলের স্বদেশ ত্যাগী উপজাতিদের প্রত্যাবাসন কামনা, ভূমি ক্রয় বন্দোবস্তি ও আগমন নির্গমনে বাঙ্গালীদের অবাধ অধিকারের অস্বীকৃতি ইত্যাদি, নিতান্তই উস্কানীমূলক বাড়াবাড়ি। তাতে যুক্তির চেয়ে হিংসাই মূখ্য। এর বিপরীতে বাঙ্গালী প্রভাবিত গোটা জাতি, উপজাতিদের বৈরী ভাবতে পারে। প্রায় ভুলে যাওয়া উপজাতীয় বহিরাগমনের ঘটনা পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠা সম্ভব। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের অভিবাসন স্বীয় স্বার্থে মেনে নিলেও তা এই স্বাধীন জাতির জন্য অপরিহায্য নয়। বাঙ্গালী বিরোধী দাবীর পাল্টা শ্লোগান উঠাও সম্ভব। তারাও বলতে পারেঃ উপজাতিরা স্বদেশে ফিরে যাও। বাঙ্গালীর আদি স্বদেশ বাংলার এই পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিরা মুল অধিবাসী নয়। একদা বিদেশী শক্তির মদদে পুনর্বাসিত অভিবাসীদের দ্বারা বাঙ্গালীরা অন্যায়ভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। উত্থাপন যোগ্য এই দাবীর পিছনে অকাট্য ভাবে ইতিহাস সাক্ষী। আজ জনবল ও বিদেশী মদদের মাধ্যমে কতিপয় বৃহৎ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের গলাবাজি আর অস্ত্রের চাপে

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গুলো স্তব্ধ আর জিম্মি হয়ে আছে। যোদ্ধৃমান বড়দের সরকারী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষুদ্ররা অসহায় অবস্থায় পতিত হবার আশঙ্কা করা যায়। বাঙ্গালী উপস্থিতি ঐ ক্ষুদ্রদের রক্ষা কবচ। বাঙ্গালীদের বিপরীতে উপজাতিদের একক জাতিসত্তা একটি ভূয়া ধারণা। তাদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রাধান্য একটি কাগুজী যোগফল মাত্র। বাস্তবে যোগসূত্রহীন কতিপয় স্বতন্ত্র সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় গাণিতিকভাবে বাঙ্গালীদের বিপক্ষে সংখ্যাগুরু, পৃথক হিসাবে নয়। বাঙ্গালীদের শক্তির ভিত্তি স্বদেশ স্বজাতি আর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা। ইহার বিপরীতে উপজাতিরা ক্ষুদ্র ও পর নির্ভর। উপজাতীয় বিদ্রোহ আর হিংসা বাঙ্গালীদের শক্তি বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। এখন তারা এতদাঞ্চলের একক প্রধান সম্প্রদায়। এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেশ ব্যাপ্ত ভূমিহীনতাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার প্রতিটি অঞ্চলের প্রতি অপ্রতিরোধ্য। বাড়তি জনসংখ্যার স্রোত কোন নিষেধাজ্ঞার প্রতিরোধেই সামাল যোগ্য নয়।। স্বদেশের ভিতরে আন্তঃ আঞ্চলিক পাসপোর্ট ও ভিসার প্রবর্তন একটি অবাস্তব কল্পনা। ইহা রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পরিপন্থী। ইহা রাষ্ট্রের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শামিল। জুম ল্যান্ড নামের প্রস্তাব হুজুগী এবং অপ্রয়োজনীয়। এই নতুন পরিচয় লাভের চেষ্টা ঐতিহ্য হানিকর। ইহার বিপরীতে জুম বঙ্গ নাম অনেকটাই ঐতিহ্যানুগ। মুসলিম বাদশাহী আলমে সীমিত হলেও এ নামটির প্রচলন ছিলো। প্রাচীন বঙ্গ নাম উহাতে অন্তর্ভূক্ত, এবং জুম ঐতিহ্যেরও স্বীকৃতি তাতে আছে।

(নভেম্বর ১৯৯২ ইং)

www.pathagar.com

দাবী দাওয়া আন্দোলন ও সমঝোতা

কারো-কারো ধারণা হলোঃ উপজাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছেঃ শুধু মাত্র স্বায়ত্ত শাসন লাভ। আরেক দল সন্দেহ করেন, স্বায়ত্ত শাসনের দাবী আসলে একটি মুখোস, এর আড়ালে মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা। ভারত এখানে একটি তাবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য বিদ্রোহীদের মদদ দিচ্ছে। মধ্য পন্থী আরেক দলের অভিমত হচ্ছে, স্বায়ত্ত শাসন বা বিচ্ছিন্নতা নয়, সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা আদায়ই আসল উদ্দেশ্য। এ মূল্যায়ন গুলির যথার্থতা যাচাই করার পক্ষে, আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও তাতে ব্যক্ত লিখিত বক্তব্যগুলির মূল্যায়নই যথেষ্ট, যা এখানে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিতহলো।

পাকিস্তান আমলে সমস্যা ছিলোঃ উপজাতীয় জীবনের পশ্চাদপদতা ও আদিমতা। সর্বত্র নিরক্ষরতা ছিলো ব্যাপক। রোজি রোজগারের প্রধান মাধ্যম ছিলো জুম কৃষি ও বনজ দ্রব্য আহরণ। প্রশাসন ছিলো আমলা নির্ভর ও সামন্ততান্ত্রিক। দারিদ্র্য আর অরাজকতা মানুষকে অসহায় করে রেখেছিলো। ষাটের দশকে কর্ণফুলী হ্রদ সৃষ্টির নিমজ্জন জনিত কারণে ঐ নদী উপত্যকার লক্ষাধিক অধিবাসী, নিজেদের বাড়ীঘর, জায়গা জমি, ফল ফসল ও বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম একসাথে মুঠভরা টাকার স্পর্শ পায়, এবং তদ্বারা সেই প্রথম স্বচ্ছলতার উল্লাস অনুভব করে। সাথে সাথে নতুন বাড়ীঘর জায়গা জমি গড়ে তোলার অনিশ্চয়তায়, বর্ধিত ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়। সরকার মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ মিটাতে যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে ব্রতী হন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়নে অধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। এত ব্যাপক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যে, তাতে ছাত্র আর শিক্ষক পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী স্বাস্থ্য আর কৃষি সম্প্রসারণের সুবিধা পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। নগদ টাকার আধিক্যে ভোগ বিলাস আনন্দ উপভোগ ও বিলাসী আয়োজন বেড়ে যায়। বন্য পশ্চাদপদ জীবন মান কাটিয়ে শহুরে সাজ পোষাক ও আধুনিকতার প্রতি লোকজন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। স্বচ্ছলতা বয়ে আনে উচ্চ শিক্ষা ও হীনমন্যতাহীন জীবন। আধুনিক জীবন বোধ গড়ে উঠে। অধিকার চেতনার জন্ম

www.pathagar.com

হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিতে পরিবর্তন আসে। পাকিস্তানের শেষ আমলে স্থানীয় শাসনের আওতায় নীচু স্তরে প্রতিনিধিত্ব মূলক পদও দায়িত্বে অনেকের রাজনৈতিক পুনর্বাসন লাভের সুযোগ হয়। বৃহৎ শিল্প ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আওতায় অনেকের কর্মসংস্থানও ঘটে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই বর্ধিত চাহিদা আর উচ্চাভিলাষই জন্ম দেয় নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের। শ্লোগান উঠেঃ স্বায়ত্ত শাসন চাই। উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আর ঐতিহ্যের রক্ষা কবচ দিতে হবে। এই বিক্ষুব্ধ নব প্রজন্মের নেতা হয়ে আবির্ভূত হোন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। আগুনের মত ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এ শ্লোগানটি। ইহারই অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে লারমা জিতে যান। জয়ের সাফল্যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য প্রীতি ও স্থানীয় আধিপত্য লাভের আকাংখা, আরো জোরদার হয়ে উঠে। কিন্তু আকস্মিক সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাদেরকে সাময়িক স্তম্ভিত করে দেয়। তবে উক্ত বিরতি কালে ও তাদের মাঝে নতুন উৎসাহের সংযোগ ঘটে। তারা মিজো স্বাধীনতাকামী ও স্থানীয় উপজাতীয় রাজাকারদের সংস্পর্শে আসে। ভবিষ্যতের সশস্ত্র আন্দোলনের একটি শিক্ষা ও সূত্র সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল হয়। পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ায়, অসহায় রাজাকার ও মিজো বাহিনী, বিমূঢ় অবস্থায় পতিত হয়। লারমা ও তার সহযোগীগণ এই সুযোগে তাদেরকে রাইংখ্যং বলেন সীমান্তবর্তী এক জুম ক্ষেত্রে আত্ম গোপন করার সুযোগ করে দেন, যে ক্ষেত্রটি বার্মা ও মিজোরামের সংযোগ স্থলের নিকটে অবস্থিত। তথাকার বেআইনী চাকমা জুমিয়াগণ, নিজেদের জুম ও বসতি রক্ষার জন্য সংসদ সদস্য লারমার উপর নির্ভরশীল ছিলো। লারমা–প্রেরিত মিজো ও রাজাকারদের আগমনে তারা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি বলেই ধরে নেয়, এবং ঐ বাহিনীদ্বয়ের রসদ যোগাতে নিয়োজিত হয়। ভারতীয় বাহিনীর ভয়ে মিজোরা কিছুদিনের ভিতর চীন পাহাড়ের দিকে সরে যায় ও আত্ম গোপন করে। উপজাতীয় রাজাকারগণ লারমার তত্বাবধানে সেখানেই থেকে যায়। অতঃপর পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ও লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং বাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন নিয়োগ ও ট্রেনিং দান শুরু হয়। এই সশস্ত্র লারমা বাহিনী পরিশেষে শান্তিবাহিনী নাম ধারণ করে এবং উহার পরিচালক রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠা ঘটে। উভয়েরই জন্ম হয় আগে পরে ১৯৭২সালে।

বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকেই গুপ্ত হত্যা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়; এবং একতরফা বাঙ্গালীরাই তার শিকারে পরিণত হয়। উপজাতীয় ছাত্র ও

www.pathagar.com

যুবকের দল সামরিক প্রস্তুতি মূলক শারীরিক কসরত ও কুচ কাওয়াজ অনুষ্ঠান শুরু করে। সশস্ত্র উপজাতীয় বাহিনীর আনাগোনা দৃষ্টি গোচর হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় চাঁদা বাজি ও হুমকি। মফস্বলে জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে উঠে। সরকারও পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হোন। নিরাপত্তা জোরদার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। লারমা দ্বৈত ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হোন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা সেজে একদল উপজাতীয় প্রতিনিধিসহ তিনি ঢাকায় পৌছে, সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত আনুষ্ঠানিক দাবী গুলি সরকারের নিকট পেশ করেন। ইহার আগে সমুদয় দাবী দাওয়াই ছিলো মৌখিক তথা অনানুষ্ঠানিক, যথাঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল, এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৩। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

(সুত্রঃ স্মারক লিপি ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)।

তবে এ দাবী গুলো নিয়ে লারমা সংসদে বা বাহিরে কোথাও তেমন সোচ্চার হোন নি । প্রকাশ্য আন্দোলন মূলক কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীও গ্রহণ করেন নি । কিন্তু তার গোবেচারা ধরনের চেহারার আড়ালে ভয়ংকর হিংস্রতা উজ্জীবিত হতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধি ও সশস্ত্র আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি এগিয়ে যায়। সরকার স্থানীয় গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা অনুমান করেন ও প্রতিরক্ষা মূলক প্রস্তুতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে কতিপয় সেনা ছাউনী প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হোন। শুরু হয়ে যায় দুর্গম চলার পথে শান্তিরক্ষী বাহিনী ও বাঙ্গালীদের উপর গেরিলা আক্রমণ। বাজার ও পণ্যবাহী যানবাহনগুলি লুট করার ঘটনা ঘটতে থাকে। যাত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় লুট ও নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। পাড়াবাসী ও ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। খুন জখম গুম ও মারপিট বেড়ে যায়। অগ্নি সংযোগের পুনরাবৃত্তিতে অনেক বাজার একাধিক বার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সেনা উপস্থিতি ও পুলিশী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। ইহারই এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে নদী বন্দর সুবলৎ বাজারে পুলিশ ও শান্তিবাহিনী সর্ব প্রথম মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শান্তিবাহিনীর পক্ষে কয়েকজন হতাহত ও ধৃত হয়। উহারই কিছু দিনের ভিতর চন্দ্রঘোনা থানা এলাকায় সেনা

www.pathagar.com

টহল দলের উপর আক্রমণ চলে। প্রমাণিত হয়ে যায় শান্তিবাহিনীর ভয়ানক হিংস্র অস্তিত্ব। লারমা এতদ্ভব ঘটনার দ্বারা উপজাতীয় মহলে এক নতুন ত্রাণ কর্তাও বীরে পরিনত হোন। ইতিপূর্বে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তার জনসংহতি সমিতি উত্তর ও দক্ষিণের উভয় আসনেই জয় লাভ করে এবং তিনি নিজে একজন সহযোগীসহ বর্ধিত শক্তিতে সংসদে পুনরাবির্ভূত হোন। তবে এ যাবৎকাল সংসদে একটি কথাই তিনি জোরের সাথে ব্যক্ত করতে সক্ষম হোন যে, উপজাতিরা বাঙ্গালী নয়, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাতীয়তাই প্রযোজ্য। সংবিধান গ্রহণ কালে তার ঐ বক্তব্য ছিলো যথার্থ, এবং তখনই রাষ্ট্রীয় কাঠামো ফেডারেল না এক কেন্দ্রিক হবে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন যথার্থ হতো। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকামী লারমা এই সাংবিধানিক প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। তার লক্ষ্য ছিলোঃ আগে শক্তি সঞ্চয় ও তৎপর বাধ্য করণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেনঃ আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রিত সরকার ও সংসদে তার স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবী হবে অরণ্যে রোদন। তিনি সতর্কতার সাথে শান্তি বাহিনী সংক্রান্ত উৎসাহ আর সংশ্লিষ্টতা গোপন রাখতে সচেষ্ট হোন। তাই তাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী পক্ষ বলে অভিযুক্ত করাও যায় নি । তার লক্ষ্য ছিলো চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যন্ত আত্ম রক্ষা ও সময় ক্ষেপন, এবং সংসদীয় ক্ষমতায় টিকে থাকা। এই কৌশলেরই অংশ হিসাবে তার বাকশালে যোগদানকে মূল্যায়িত করা যায়। তবু ইতিমধ্যে তিনি সংগোপনে বিতর্কিত হয়ে যান। তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াহিবহাল হয়ে পড়েন। তিনি নিজেও ব্যাপারটি আচঁ করতে সক্ষম হোন ও নতুন করণীয় উদ্ভাবনে নিমগ্ন হোন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটে যায়। বাকশালী সরকারের পতন ঘটে। তাদের অনেকেই নিহত হোন। ক্ষমতার পট পরিবর্তনে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লারমা আত্ম গোপন করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের সাথে তার যোগাযোগ ও সমঝোতা হয়ে গেছে। তিনি কৌশল হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরাকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় মদদ যোগাযোগ ও নিরাপত্তার ছত্র ছায়া নিশ্চিত করাই ছিলো উহার উদ্দেশ্য। একদা নির্বাচনী বাজি মাত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চারিত হয়েছিলো যে উৎসাহ বর্ধক ও উত্তেজক শ্লোগান, পরবর্তীতে তা-ই উচ্চাভিলাষী করে তুললো তার প্রবক্তা নেতৃবৃন্দকে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের জন্ম রহস্য তাদেরকেও অত্যুৎসাহী করে তুললো। আঞ্চলিক ভাবে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য, সীমান্তে অবস্থিতি, পার্বত্য দুর্গমতা এবং সর্বোপরি বিদেশী মদদ লাভের নিশ্চয়তা মূলক উৎসাহী আনুকুল্য, লারমা ও তার সহযোগীদের উজ্জীবিত করে তুলে। তারা ভাবতে শুরু করেন শুধু স্বায়ত্ত শাসন নয়, আরো অধিক কিছু পাওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি অনুকুল। সংখ্যাগত প্রাধান্যের গুণে হিন্দুদের জন্য ভারত, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, এবং বাঙ্গালীদের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

সম্ভব হওয়ায়, উপজাতীয় প্রাধান্যের বলে জুম্ম ল্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও সম্ভব। এই উচ্ছ্বাস ও উচ্চাশায় অস্ত্রবাজি, চাঁদা সংগ্রহ আর লাল নির্মূল অভিযান জোরদার করা হয়। সমগ্র মফস্বল অঞ্চল সন্ত্রাসী তৎপরতায় ভরে যায়। একটি বিদ্রোহী সরকারই যেন পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠে। পরিস্থিতি হয়ে যায় ঘোলাটে।

ইতিমধ্যে বিপ্লব জনিত বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা কেটে গেছে। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান পাকা পোক্ত ভাবে ক্ষমতা সামলে নিয়েছেন। তিনি অনতিবিলম্বে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিদ্রোহ অবসানের লক্ষ্যে আলোচনা ও পরামর্শ লাভের আশায় রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে বৈঠকে বসেন। কিন্তু আলোচনায় উগ্রতা ও আঞ্চলিকতার প্রাধান্য ঘটায়, তিনি হতাশ হোন। তাঁর ধারণা জন্মেঃ উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যই উগ্রতা ও বিদ্রোহের ভিত্তি। বিদ্রোহী বহির্ভূত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ উদার ও নমনীয় নন। সেই বৈঠকে তারা নিম্নোক্ত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, যা কার্যতঃই সমঝোতা মূলক নমনীয় ছিলো না, যথাঃ-

১। "আমার মাতৃস্তন্য কাহাকেও ধরিতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

২। বেআইনী বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারীদের স্রোতধারা অবিলম্বে ও নিশ্চিত রূপে বন্ধ করিতে হইবে।"

৩। "উপযুক্ত তদন্ত পূর্বক এ যাবৎকাল পর্যন্ত বেআইনীভাবে বন্দোবস্তিকৃত, হস্তান্তরিত এবং দখলিকৃত জমি হইতে বহিরাগতগণকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।"

৪। "চির প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি প্রশাসন সম্বন্ধীয় বিধি এবং উপবিধি সমূহ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।"

উপরোক্ত দাবীগুলোর প্রত্যেকটি উগ্র অসহনশীল ও একপক্ষদর্শী। এতে একটি মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী শক্তিকে যেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। এতদাঞ্চল যেন মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা ছিনিয়ে আনা নয়, বরং এই পর্বতাঞ্চলের পক্ষে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্তি যেন উপজাতীয় করুণা। বাঙ্গালীরা তাদের কাছে তুচ্ছ করুণার পাত্র। এই পার্বত্য ভূখন্ড যেন উপজাতিদের এক পক্ষীয় চিরকালিন লাখেরাজ সম্পত্তি। এই উগ্র এক পক্ষীয় তিক্ত বক্তব্যের দ্বারা বিদ্রোহকেই সমর্থন দেওয়া হয়। এখানে সমঝোতা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে নি। উহাতে আরো কিছু উচ্চাভিলাষী দাবী সন্নিবেশিত হয়, যথাঃ-

ক) "উপজাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাসনকার্যে জিলা প্রাশসককে সাহায্য ও উপাদেশ দানের জন্য উপজাতীয় জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হউক।"

www.pathagar.com

খ) বর্তমান পুলিশ প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া, বর্তমান পুলিশ বাহিনীর স্থলে, পূর্বতন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ প্রধানতঃ এই জিলার উপজাতীয় লোকগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হউক।" (সূত্রঃ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসন জনাব জিয়াউর রহমানকে প্রদত্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মারক লিপি তাং ১৯-১২-৭৫ইং)।

জনাব জিয়াউর রহমান ইহাকে উপজাতীয় বাড়াবাড়ি জ্ঞান করে সিদ্ধান্ত নেনঃ তাদের আপত্তিকৃত বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই উপজাতীয় প্রাধান্যের বিপদের মোকাবেলা করা সঠিক হবে। সংখ্যা প্রাধান্যের বলেই উপজাতিরা উগ্র ও দুর্বিনীত। ইহার স্থায়ী সমাধানই হলো; বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি। সংখ্যা লঘু না হওয়া পর্যন্ত তারা দমবে না। ইহার পাশাপাশি যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজও চালান দরকার। প্রতিরক্ষা মূলক প্রস্তুতি চালাতে হবে। সুতরাং শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালী পুনর্বাসন। সেনা ছাউনী বৃদ্ধির প্রতি জোর দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে অধিক মনোযোগঘটে।

অতীত অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই মনে করেন; বাঙ্গালী পুনর্বাসনই উপজাতিদের হিংসাত্মক আচরণের মূল কারণ। কিন্তু ঐ প্রতিবাদীরা জানেন না যে, ওদের অনেকের বাঙ্গালী বিদ্বেষ একটি দীর্ঘ লালিত স্বভাব। উপরোক্ত স্মারক লিপির প্রথম দফা গুলি ইহার প্রমান। বাঙ্গালী পুনর্বাসন ইহার পরের ঘটনা। অপ্রিয় হলেও বাঙ্গালী পুনর্বাসন কাজটি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার অপরিহার্য অংশ। স্থানীয় বিদ্বিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু করার মাধ্যমেই এতদাঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে। নতুবা ইহা হয়ে থাকবে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের ঘাটি। সংখ্যাগত প্রাধান্যের মাধ্যমে প্রাপ্য আধিপত্য লাগামহীন উচ্চাকাঙ্খা পূরণের কারণ হতে পারে। যদ্বারা আনুগত্য-হীনতা ও বিদ্রোহ ঘটা সম্ভব। সন্দেহ ভাজনদের সংখ্যা লঘুতে পরিণত করার অর্থ তাদের প্রতি অত্যাচার করা নয়। জাতি ও দেশের কল্যাণে ইহা তাদের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার। দেশ রক্ষায় প্রাণ দিতে হয়। জাতীয় সম্মান রক্ষায় অনেক কিছু হারাতে হয়। ইহা আত্মদান ও স্বার্থ ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত। তাতে ক্ষতি আর পীড়ণ থাকলেও তৃপ্তি দায়ক অহংকারও নিহিত। উপজাতিদের সংখ্যালঘুতে পরিনত হওয়া এমনি এক মাহাত্ম্য মন্ডিত কাজ। জাতি ও দেশের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়। এই অপ্রিয় কাজ স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এক শক্তিশালী পক্ষ ইহার বিরোধিতা করবেই। সংঘর্ষ সংঘাতে জানমালের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবু লক্ষ্য অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। জনাব জিয়াউর রহমান, এ সব সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই, বাঙ্গালী

www.pathagar.com

পুনর্বাসনে অগ্রসর হোন। তার আকস্মিক শাহাদাতের ঘটনায় পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়। নতুবা এতদিনে উপজাতিদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া ছিল নিশ্চিত। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতীয় স্বাধিকার অর্জনের অস্ত্রবাজি, তার দার্শনিক ভিত্তি হারিয়ে নেহাত দুষ্কর্মের চরিত্রই ধারণ করতে বাধ্য হতো। তাদের সন্ত্রাসের আশ্রয় ও ঘাটিগুলি হতো বাঙ্গালীদের দ্বারা দখলীভূত। বন ও পাহাড়ের নির্জন দুর্গমতা ঢেকে রাখার মত আচ্ছাদনে বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখতে পারতো না। দমিয়ে যাওয়া ছিলো তাদের পক্ষে অবধারিত। গুপ্ত হত্যা আর সন্ত্রাস অব্যাহত থাকলেও তার শক্তি হতো দুর্বল। দেশ জয় করার মত সাহস ও চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকা কোন মতেই সম্ভব ছিলো না। ফলে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী পক্ষ হতাশায় আক্রান্ত হতো। পরিস্থিতি তাদেরকে অস্ত্র বাজি থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দিতো।

পরবর্তী এরশাদ সরকার উচ্ছ্বাসও উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া ছাড়াই, বাঙ্গালী পুনর্বাসন ও সেনা অভিযান এক তরফাভাবে স্থগিত করে দেন। কোন্দলরত ক্ষুদ্র একদল বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা আশ্রয় দিয়ে অবশিষ্টদের আত্মঘাতী সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে দেন; এবং বিদ্রোহীদের দাবীকৃত স্বায়ত্ত শাসনের বিপরীতে স্থানীয় সরকার পরিষদ শাসনের এক অভিনব অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক স্বশাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেন। পরিস্থিতির উন্নয়ণে যে ব্যবস্থাগুলি মোটেও ফলপ্রসূ প্রমানিত হয় নি।

বাঙ্গালী পুনর্বাসন ও সেনা অভিযান স্থগিত করণ এবং দল ছুট বিদ্রোহীদের আশ্রয় দানের পরে সন্ত্রাস বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এবার বাঙ্গালী পাহাড়ী পরস্পরের পাল্টা হানাহানি স্থানীয় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। উপদ্রুত পাহাড়ীদের বিরাট একটি দল ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে পালিয়ে গিয়ে, আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি নির্যাতনের বদনাম, আন্তর্জাতিক ভাবে রটতে শুরু করে। তখন সরকার বিষয়টি হাল্কা করার জন্য বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। কিন্তু আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে। সরকার পক্ষের নয় দফা, আর বিদ্রোহী পক্ষের পাঁচ দফা সম্বলিত দাবী–পত্রগুলিই মাত্র পরস্পরের কাছে হস্তান্তরিত হয়। আলোচকদের মাঝে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত না থাকায়, ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব হয় নি। সুতরাং সমঝোতার পর্যায়ে পৌছা দুরূহই থাকে। বৈঠক চালিয়ে যাওয়া নিষ্ফল ভেবে, ৬ষ্ঠ বৈঠকের পরে বিদ্রোহী পক্ষ তা বর্জন করেন। অপর দিকে বিদ্রোহীদের ব্লেকমেল করার লক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতীয় রাজনীতিকদের ক্ষমতার টোপ হিসাবে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। বিদ্রোহীদের দাবীকৃত পাঁচ দফায় অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় ক্ষমতা গুলির অতিরিক্ত কিছু সুযোগ; তাতে অন্তর্ভূক্ত হয়। শুধু

www.pathagar.com

প্রদেশ নাম ও গভর্ণর পদের ব্যবহারটাই বাদ থাকে। কিন্তু উহা হয় কার্যতঃ আত্মঘাতী ব্যবস্থা, অথবা ফাঁকি।

বাস্তবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে এক কেন্দ্রিক। ফেডারেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা তাতে সংগতি পূর্ণ নয়। এই সাংবিধানিক অসুবিধা যুক্তি সঙ্গতভাবে বিবেচ্য। ইহার পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হতে পারে। এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আপোষ মীমাংসার বিকল্প উথাপিত হওয়াও সম্ভব। প্রাদেশিক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের বিপরীতে রক্ষা কবচ হলো রাজ্য পাল বা গভর্নরের উপস্থিতি। এবং তার পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োগের ক্ষমতা। সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায়, তিনি কেন্দ্রের পক্ষে প্রধান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। প্রাদেশিক সরকার তার আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রাদেশিক সরকারের অর্থঃ সামন্ত শাসন কর্তৃপক্ষ নয়, বা তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রশাসনিক কর্তৃত্বও নয়। বর্ণিত স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থায়, এরূপ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা রাখা হয় নি। স্থানীয় সরকার প্রধান চেয়ারম্যান ও তার পরিষদের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরোপকারী কোন স্থানীয় সার্বক্ষণিক কর্তৃপক্ষ নেই। অন্ততঃ একজন পলিটিকেল এজেন্ট নিয়োগ ও তাকে আনুষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিয়ে পরিষদকে কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা যেতো। জিলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হলেও তিনি আমলা। তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য আইনতঃ প্রাপ্য নয়। পারিষদীয় আইনে তিনি চেয়ারম্যানের অধীন একজন সচিব মাত্র। সুতরাং প্রাদেশিক ব্যবস্থার মত ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, বর্ণিত পারিষদীয় ব্যবস্থায় নেই। ইহাতে ক্ষমতা এক কেন্দ্রিক। দুরবর্তী কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপই তাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। এই নিয়ন্ত্রণ সার্বক্ষণিক ও স্থানীয় না হওয়া অসুবিধা জনক। চেয়ারম্যান পদটি অগণতান্ত্রিকভাবে শুধু উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। ইহা এক পক্ষীয় তোষামোদ মূলক ব্যবস্থা। ইহাও প্রাদেশিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। প্রদেশ নাম, রাজ্যপাল বা গভর্ণর পদ, ভারসাম্যময় গণতান্ত্রিক শাসন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা বাদে, সবই বর্ণিত পারিষদীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইহা প্রাদেশিক শাসনের পরিপূরক বিকল্প এক পক্ষীয় স্বশাসন ব্যবস্থা তথা এক নতুন সুবিধাবাদ। এর বিপরীতে গভর্ণর নাম বাদে একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, তথা পলিটিকেল এজেন্টের অধীনে, স্বশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠন করা, যুক্তি যুক্ত হতো। উহাতে স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যম হতো; কিছু সংরক্ষিত আসন সহ গণতান্ত্রিক নির্বাচন। পাঁচ দফায় দাবীকৃত ক্ষমতার কাঠামোতে, সম্মত বিষয়গুলি হতো, স্থানীয় সরকারের দায়িত্বাধীন। বিদ্রোহী পক্ষের তাতে সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু এক রোখা অরাজনৈতিক চিন্তা সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

www.pathagar.com

ফলে শান্তি স্থাপন পিছিয়ে যায়। স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। ইহা হয়ে যায় বাস্তবে শান্তি-মুক্ত-ক্ষমতা-লিপ্সু খাই-খাই পরিষদ। যাদের নিজেরাই নিজেদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। বাইশটি তালিকাভুক্ত ক্ষমতার সার্বিক হস্তান্তর ও সাংবিধানিক নিশ্চয়তার দাবীতে তারা এখন সোচ্চার। তাদের এই দাবী বিদ্রোহীদের সমালোচনারই প্রতিধ্বনি। এই পারিষদীয় ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং শান্তি স্থাপন ও শান্তকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ। এই চেপে দেওয়া পারিষদীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা মানে একটি অযথা ব্যয় বাহুল্যকে বয়ে চলা, শান্তি স্থাপণে যার কোন ভূমিকাই নেই। অশান্তির জন্য যাঁরা দায়ী, সেই বিদ্রোহীরাই প্রত্যক্ষভাবে শান্তির চাবিকাঠি। তাদের সাথেই সমঝোতার প্রয়োজন।

বিদ্রোহীদের দাবীর পরিধি এখন সীমিত হয়ে পড়েছে। তারা এখন শান্তি স্থাপনের প্রতি অধিক আগ্রহী। তাই স্বেচ্ছায় অস্ত্রবাজি থেকে বিরত হয়েছে। তাদের দাবীকৃত স্বায়ত্ত শাসনের পাঁচ দফা এখন আর আগের পর্যায়ে নেই। একচেটিয়া উপজাতীয় সুবিধাবাদ নয়, গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাই তাদের কাম্য। এই নমনীয়তা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। তাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলি প্রনিধান যোগ্য, যথাঃ-

"জুম্ম জনগণ আজ সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে বদ্ধ পরিকর। জুম্ম জনগণের এই আন্দোলন অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন। এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিকভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচিতি জন্মভূমি ও ভিটা মাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে চায়। চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা। অতি দ্রুতগতিতে অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংহতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস প্রথা প্রবাদ ভাষা ঐতিহ্য ভূমির অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না।

www.pathagar.com

(সূত্রঃ জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি তাং-৩১/১০/৯১ ইং)

এই বিবৃতিকে বলা যায় সমাধানের সংশোধিত সর্বশেষ মূলনীতি, যা কার্যতঃ অতি উদার ও বিজ্ঞ ধ্যান ধারণার সমষ্টি। ইহাকে ভিত্তি করে সহজে সম্মানজনকভাবে সংকট উত্তরণ সম্ভব। উপজাতীয় সমষ্টিকে তাত্ত্বিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে বাংলাদেশী জাতির শাখা বলে স্বীকৃতী দেওয়া যায়। এমনিতে শব্দটি সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার পরিবর্তে সংজ্ঞাটির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হওয়াই ভালো। জুম্ম জাতি বা জুমিয়া জাতি সংজ্ঞাটির চেয়ে উপজাতি সংজ্ঞাটি অধিক সম্ভ্রান্ত। জুম ও জুমিয়া সংজ্ঞায় একটি অনুপযোগী পেশা ও আদিমতা সংশ্লিষ্ট। উপজাতীয়দের সবাই নয়, অতি স্বল্প সংখ্যক পশ্চাদপদ লোকই উক্ত ঐতিহ্যের ধারক। তাই আধুনিক কালের গর্বিত সুসভ্য শিক্ষিত লোকজন, তদ্বারা পরিচিত হতে কুণ্ঠিত হবেন। সুতরাং জুম্ম জাতি নয়, আভিধানিক উপজাতি পরিচিতি হবে সঠিক ও সুখকর। স্থানীয় ভৌগোলিক নামটিও জুম্মল্যান্ড নয়, জুম-বঙ্গ রাখা যেতে পারে। নামটি বাংলা ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতীতে এ নামটি প্রচলিত ছিলো। রাণী কালিন্দীর একটি পাট্টায় এ নামের প্রচলন সমর্থিত হয়। মোগল আমলের জরিপী কাগজ পত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং এ দুটি নাম প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক ও কুলিন। এ দুটি নামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক। উপজাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারটি বিরোধীয় নয়। ইহা জাতীয় বৈচিত্রের অঙ্গ। তাদের ভাষা আচার আচরণ প্রথা ও জীবন যাপনের বর্ণাঢ্যতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এবং তজ্জন্য দরকার পৃথক ঐতিহ্য সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তার একটি শাখা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত হবে একটি ঐতিহ্য পরিষদ। সরকারী ব্যয়ে তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা ও চর্চার ব্রতী হবেন। আন্তঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক মিশ্রণ এবং কলুষতাকে পরিহার করাও হবে তার দায়িত্ব। একেকটি বিশেষ এলাকাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করাও যাবে। বিশুদ্ধতাবাদীরা সেখানে নিজেদেরকে অপরদের সংমিশ্রণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু মিশ্র অঞ্চলই হবে প্রধান, যেখানে সবার সম্মিলিত বসবাসের অধিকার থাকবে।

জুম্মজাতি ও জন্মভূমির অস্তিত্বের অধিকার হিসাবে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে, সংরক্ষিত উপজাতীয় স্বশাসিত অঞ্চল ভাবা হলে, তা বাস্তব সম্মত হবে না। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এখানে বাঙ্গালীদের এবং অবশিষ্ট অঞ্চলে উপজাতিদের সমান ভূম্যধিকার অবশ্যই প্রাপ্য। উপজাতি ও বাঙ্গালী সবাই জাতীয় সদস্য। তাদের কেউ কোথাও অবাঞ্ছিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা পশ্চাদপদদের বিশেষ সুবিধাসহ, অবশ্যই মঞ্জুর যোগ্য। ইহা আবশ্যিক

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার। এ দাবীতে অন্যায় কিছু নেই। তবে এর ভিতর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বজনিনতা থাকতে হবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ বলিয়ান দুর্বল সবার সমান সংস্থান থাকাই সঙ্গত। কারো আধিপত্য আর কারো অধীনতা কাম্য নয়। একটি ভারসাম্যময় ব্যবস্থাই বাস্তবায়িত হতে হবে। সাংবিধানিক এক কেন্দ্রিকতা ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতাকে রক্ষা করে, আঞ্চলিক স্বশাসন ব্যবস্থা, উদ্ভাবিত হতে হবে। তাতে আন্তর্জাতিক উদাহরণ ও রাজনীতি-বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ জরুরী। নিজেদের ইচ্ছা খুশী নয়, একটি বিজ্ঞান সম্মত কার্যকর ব্যবস্থাই বাঞ্ছিত। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ইহার পথ নির্দেশ করতে পারেন। এখন দরকার নৈতিক সমঝোতার, যে নীতিকে অবলম্বন করে, বিশেষজ্ঞ কমিটি, কাঠামোগত বিন্যাস নির্ধারণ ও তার পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করবেন। রাজনীতিকদের বিশেষজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ অনুচিত। তা না হলে হুজুগ ও আবেগের প্রভাবে এবং ইচ্ছা খুশির প্রতিক্রিয়ায় পরিকল্পনাটি ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য হবে। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সাংবিধানিক মূলনীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন অধিকারকে নিশ্চিত করে আঞ্চলিক স্বশাসন পরিচল্পনা উদ্ভাবন ও উপস্থাপনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যে কমিশনে উপজাতীয় পক্ষের পছন্দসই আইনজ্ঞ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণও অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। অন্তবর্তীকালের জন্য তিন জিলা পরিষদই সাধারণ স্থানীয় শাসনের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত হোক। স্থানীয়-সরকার-পরিষদ-আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির প্রয়োগ, স্থগিত হওয়াই সঙ্গত। তার স্থান দখল করবে প্রচলিত সাংবিধানিক আইন। এই নৈতিক সমঝোতার অধীনে সব সন্ত্রাসী তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধেরও অস্ত্র সহ বিদ্রোহীদের আত্ম সমর্পণের আদেশ, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ জারি করবেন। সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন, এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত ভাতার মঞ্জুরী দিবেন।

বিদ্রোহী পক্ষ উদার নমনীয়তা দেখালেও তারা কোন ঘোষণার দ্বারা স্বায়ত্ত শাসনের রূপ রেখা সম্বলিত স্বীয় দাবী নামা বা তার অংশ বিশেষ এখনো সংশোধন বা প্রত্যাহার করেন নি। ৬ষ্ঠ বৈঠকের পরবর্তীকালে প্রদেশের স্থলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনে তাদের সম্মতি থাকার কথা প্রচারিত হয়েছিল। তবে তদ্বারা কোন শুভ প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। এখন ইহা অস্পষ্ট যে, তারা স্বায়ত্ত শাসন ও বাঙ্গালী প্রত্যাহারের দাবীদ্বয় পরিত্যাগে সম্মত কিনা। এ দুটি বাস্তবিকই মৌলিক প্রতিবন্ধক প্রশ্ন। দেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালী। মীমাংসা অংশতঃ তাদের স্বার্থ ও সম্মতির সাথে জড়িত। কোন সরকারের পক্ষেই এ নাজুক প্রশ্নে একতরফা আপোষ করার অবকাশ নেই। দল মত নির্বিশেষে গোটা বাঙ্গালী

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের এ জটিল ব্যাপারে একক একতরফা/ত্যাগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও অসম্ভব। সুতরাং এ দুটি প্রশ্নে উপজাতীয় পক্ষকে অবশ্যই ছাড় দিতে হবে। জাতি রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের দ্বারা ফেডারেল রাষ্ট্র গঠণে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত, স্বায়ত্ত শাসনের দাবীটি স্থগিত রাখাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের স্থপতি বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে আস্থায় আনয়নই উপজাতীয় সুবিধা সুযোগ লাভের উপায়, তাদের বৈরীতা ক্ষতিকর। এই সত্য কথাটির প্রতি প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং বাঙ্গালীদের সাথে বৈরীতা নয়, সহাবস্থান ও সৈখ্যই উপজাতীয় স্বার্থের অনুকূল। এই উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হতে হবে। বাঙ্গালী পাহাড়ী একমত হলে, এখানে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। এই সুন্দরতম উর্বর প্রাকৃতিক অঞ্চল, তার জনগণের ভাগ্যোন্নয়ণের এক সোনার খনি। একে বৈরীতা আর হিংসায় অকেজো করে রাখা দুর্ভাগ্যজনক। সমঝোতার সূত্র ইহাই।

(অক্টোবর ১৯৯২ ইং)

www.pathagar.com

প্রশাসনিক এখতিয়ার ও সংজ্ঞা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১% লোক মাত্র অবাঙ্গালী। তাদের প্রায় অর্ধেক পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। এদের বোঁচা গঠন, শারীরিক খর্বাকৃতি ও উজ্জ্বল রং একটি পৃথক পরিচিতির বাহন, যদ্বারা বাঙ্গালীদের বিপরীতে একটি পৃথক জনসমষ্টি বলে তাদের পরিচিতি নিশ্চিত হয়। ঐ পৃথক পরিচিতিকে সংজ্ঞায়িত করে উপজাতি নাম বা বিশেষণের প্রচলন ঘটেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থঃ শাখা জাতি। তবে বাংলাদেশী শাখা জাতি হিসেবে এটির ব্যবহার প্রচলিত হয় নি। আদিম পশ্চাদপদ পাহাড়ী লোকই তদ্বারা বুঝান হয়ে থাকে, যা বস্তুতঃ মনগড়া ধারণামাত্র। তাত্বিক অর্থে ঐসব লোকই উপজাতি, যারা টুটেমে বিশ্বাস করে, টাবু মানে ও আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুরূপ লোক দুষ্প্রাপ্য। এখানকার অবাঙ্গালীদের সবাই সুসভ্য সমাজের লোক। শিক্ষা সংস্কৃতি আচার আচরণ পেশা গৃহায়ণ স্বাস্থ্য সামাজিকতা ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি সভ্যতা গুণের একটিও তাদের মাঝে অনুপস্থিত নেই। ধারণা করা হলেও, তারা বাস্তবে বাংলাদেশী সাধারণ মানের অধিক অনুন্নত আর পশ্চাদপদও নয়। শারীরিক রং গঠন ও অবয়ব গুলে তারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, যাদের বিপরীতে বাঙ্গালীরা আর্য-দাবিড়ী সংকর। এই মানব শ্রেণীগত পার্থক্য উপজাতীয়তার সূত্র নয়। সংজ্ঞাটি মূলতঃ তাত্বিক। আদিম অনুন্নত জীবন যাপন আচার আচরণ ধারণাও বিশ্বাসের সাথে উহা সংশ্লিষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সমষ্টি অর্থেও ইহার ব্যবহার যথার্থ নয়। দেশের প্রধান সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের বিপরীতে পৃথক জনসমষ্টি বুঝাতে বিকল্প অবাঙ্গালী বিশেষণের প্রয়োগ এক্ষেত্রে করা যেতো। উহা সহজবোধ্য এবং উপজাতি সংজ্ঞার যথার্থ বিকল্পও বটে। বাঙ্গালী নয় এরূপ লোক সমষ্টি বুঝাতে উপজাতি সংজ্ঞার বিপরীতে উহার ব্যবহার যথার্থ হতো।

উপজাতি সংজ্ঞাটি বজায় থাকার কারণে তার বিপরীতে অউপজাতি শব্দ প্রচলিত হচ্ছে যা ব্যাকরণ ও ভাষার বিচারে আরেক ভুল প্রকরণ। উপজাতির সঠিক বিপরীত শব্দহলো অনুপজাতি যা অপ্রচলিত আর অপ্রাঞ্জল। এই ভুল আর অপ্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগ থেকেও বাঁচার উপায়ঃ উপজাতি শব্দের পরিবর্তে অবাঙ্গালী শব্দের ব্যবহার।

www.pathagar.com

এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও উপজাতি নামে কথিত লোক পাওয়া মুশকিল। তবে অতীতে এতদাঞ্চলে অনুরূপ লোকের উপস্থিতি স্থানীয় আইনের ভাষায় স্বীকৃত। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১/১৯০০ এর ধারা ৪০ ও ৫২তে উপজাতি অধিবাসীদের উল্লেখ আছে, তবে তাতে তাদের কোন সাম্প্রদায়িক নামের উল্লেখ না থাকায় ঐ পরিচয় সুনির্দিষ্ট নয়। স্থগিত ৫২ ধারার বর্ণনাটি ঐতিহাসিক। উহা এতদাঞ্চলবাসী অবাঙ্গালীদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারক সরকারী দলিলও বটে। আইনটি নামেই অভিবাসন আইন। স্বদেশত্যাগী বিদেশী ও বিজাতীয় লোকদের স্থানীয় নাগরিক হওয়ার সুযোগ তাতে নিহিত। অভিবাসীদের তালিকায় মগ ও চাকমাদের সাম্প্রদায়িক নাম উল্লেখিত হয়েছে। উপজাতি ও আদিবাসী পাহাড়ী বলে তাতে ভিন্ন লোকের বর্ণনা আছে। সুতরাং ঐ অভিবাসন আইনের বর্ণনা সূত্রেই চাকমা ও মগেরা সম্প্রদায় মাত্র–উপজাতি বা আদিবাসী পাহাড়ী লোক নয়। স্থানীয় উপজাতীয় আদিবাসী পাহাড়ী নামীয় ভিন্ন লোকজন নির্দিষ্ট না হলেও, ইহা পরিষ্কার যে চাকমা ও মগেরা তা নয়। ঐ আইন তাদেরকে উপজাতীয় বহির্ভূত অস্থানীয় অপাহাড়ী সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণা করেছে। পরবর্তীকালে এই মর্যাদার কোন সংশোধন ও হয় নি। সংশ্লিষ্ট লোকজনের এই প্রশ্নে কোন আপত্তি উত্থাপনের কথাও সমর্থিত নয়। সুতরাং যারা গত শতাধিক বৎসরের মধ্যে কখনো উপজাতি, আদিবাসী, আর পাহাড়ী বলে আইনতঃ স্বীকৃত নয়, এবং প্রকাশ্যে অস্থানীয় অপাহাড়ী অভিবাসী ঘোষিত, তাদের পক্ষে অধুনা স্থানীয় উপজাতীয় আদিবাসী পাহাড়ী অভিহিত হওয়া ও তৎসংশিষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করা বেআইনী। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, জমি বন্দোবস্তি ও বনজদ্রব্য ভোগের রেয়াতী সুবিধা, আয়কর অব্যাহতি, স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান পদও বর্ধিত সদস্য কোটা ইত্যাদি আইনতঃ আদিবাসী পাহাড়ী ও উপজাতিদের প্রাপ্য, চাকমাও মগেরা তাতে অন্তর্ভূক্ত নয়। এদের বাদে আরাকান লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরা ত্যাগী অন্যান্য অভিবাসীগণ মূলতঃ তাদের স্ব স্ব জাতীয় অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ী। ৫২ ধারায় তাদেরকেও স্থানীয় স্বীকার করাহয় নি। তবে তাদের পাহাড়ী উপজাতি হওয়া ঐ আইনে সমর্থিত। মগ ও চাকমাদের আদিবাস ঐসব অঞ্চলে হয়ে থাকলেও তারা উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী মর্যাদায় অভিষিক্ত নয়। এখন ঐসব মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সুযোগও নেই।

আইনে প্রদত্ত অভিবাসনের সুযোগ সংশ্লিষ্ট লোকজনের কেহই আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে নি। তাদের স্থানীয় নাগরিকত্ব প্রমানের জন্য অভিবাসন সনদ থাকা জরুরী। এই প্রশ্ন শতাধিক বৎসর পরেও উত্থাপিত হতে পারে। সপ্রমাণ অভিবাসনই তাদের এ দেশীয় নাগরিকত্বের বৈধ সূত্র। দীর্ঘ বসবাস ও জন্ম মৃত্যু বিদেশে ঘটাও

www.pathagar.com

সম্ভব। তদ্বারা বিদেশের মাটিতে অধিকার বর্তায় না। আইনে ঘোষিত অভিবাসীদের বেআইনী বসবাস একমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর পক্ষেই বৈধ করা সম্ভব। সংগ্রাম সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস–সে সুযোগ মঞ্জুরের উপায় নয়। মূল অধিবাসীদের বিদ্বিষ্ট করে ক্ষুদ্র অভিবাসী সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠা লাভ অত্যন্ত দুরুহ কাজ। পার্বত্য অভিবাসী বংশধরদের এ প্রশ্নে গভীর চিন্তা ভাবনা করা দরকার। মূল অধিবাসীরা বহিরাগত অবাঙ্গালীদের বিদেশী বিজাতীয় হওয়ার কথা ভুলেই গেছে। এতদাঞ্চলের লোকজ ইতিহাস সঠিকভাবে রাখাও হয়নি । প্রচলিত লোক শ্রুতি গল্প গুজব ও রূপ কথার অতিরঞ্জিত আর অবিশ্বস্ত কথা কাহিনী, ইতিহাসের শূণ্যতাকে পূরণ করে নিয়েছে। তাই অনেক পন্ডিত ব্যক্তি আর কর্তৃপক্ষীয় লোকদেরও তদ্বারা বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। এ কারণেই আশ্চর্য্যজনক হলোঃ বাংলাদেশের খাটি আদিবাসী বাঙ্গালীদের তাদের স্বদেশেরই এই অংশে বহিরাগত বে আইনী অনুপ্রবেশকারী এবং অবাঙ্গালীদের প্রতি অত্যাচারী বলে গণ্য করাহয়। অথচ প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হলোঃ খোদ অবাঙ্গালীদেরই বৃহদাংশ এ দেশের বৈধ অধিবাসী নয়। মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের তুলনায় তারা পশ্চাদপদ বা আদিমও নয়। বাঙ্গালীরা তাদের হাতে অত্যাচরিত। সহনশীল অসাম্প্রদায়িক হওয়ার অনুশীলন ও সুনাম বাঙ্গালী চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী–গরিষ্ঠ অঞ্চলে সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। অবাঙ্গালী–গরিষ্ঠ, অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামে ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার ভিন্ন কারণ থাকাই সম্ভব। এখানে বাঙ্গালীরাই আক্রান্ত ও আত্মরক্ষায় লিপ্ত। উগ্রতাই এখানে মূল সমস্যা। স্থানীয়ভাবে উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিনত হওয়া ভিন্ন তাদের এ উগ্রতা প্রশমিত হবে বলে মনে হয় না। শান্তির প্রয়োজনে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়াই সঙ্গত। এছাড়া তাদের উগ্র মানসিকতার প্রশমন হবে কি না তা সন্দেহের বিষয়।

বাঙ্গালী পুনর্বাসন একটি অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। ভূমিহীন, বাস্তুচ্যুত, আর জন্ম জনিত বাড়তি জনসংখ্যার ভূমি সংস্থান, আঞ্চলিক গ্রহণ ক্ষমতার ভিত্তিতে অবশ্যই করনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তার দায়ভাগ নিতে হবে। এতদাঞ্চলকে দেশের ভিতর আরেক দেশ এবং অবাঙ্গালীদের জাতির ভিতর আরেক জাতি হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। বিজাতীয় সীমান্তে অবাঙ্গালী নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থাকা প্রতিরক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। এ ভাবনা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অংশ।

অনুরূপ জরুরী প্রয়োজনে সন্দেহ ভাজন লোকদের সংখ্যাগত শক্তিকে সহনীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, সংশ্লিষ্টদর প্রতি অন্যায় আচরণ বলে স্বীকার্য নয়। ক্ষতিকরণ ওবিনাশ সাধন নিয়ন্ত্রণের সমার্থক নয়। স্বপক্ষীয় গরিষ্ট জনশক্তির পুনর বিন্যাসের মাধ্যমে সন্দেহ ভাজনদের প্রতিটি অঞ্চলে সংখ্যালঘুতে পরিনত করা এবং

www.pathagar.com

বিশেষতঃ বিজাতি সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলকে তাদের প্রাধান্য মুক্ত পরিবেশে পরিনত করা অপরিহার্য্য। তদ্বারা ঐসন্দেহ ভাজনরা অযথা সন্দেহ আর হয়রানীর শিকার হওয়া থেকেও রক্ষা পাবে। কাজটি সংশ্লিষ্টদের পক্ষে অপ্রিয় হলেও স্থায়ী নিরাপত্তা ও দেশরক্ষার স্বার্থে জরুরী। ইহাই নিয়ন্ত্রণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সামগ্রিক ভাবে খাটি বসতি অঞ্চল নয়। ইহা সামগ্রিক ভাবে স্থানীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত এলাকাও নয়। মূল থেকে ইহার বৃহদাংশ, সাধারণ প্রশাসন বিহর্ভূত খাস বনাঞ্চল। প্রকৃত বসতি অঞ্চল, উহার সামগ্রিক আয়তনের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। উহাতেই স্থানীয় প্রশাসনকে সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল গুলি জাতীয় সম্পত্তি– আঞ্চলিক নয়। অভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হলেও এগুলি ভিন্ন কর্তৃত্বে বন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র অঞ্চল। বন ও বসতি মিলে ভৌগোলিক প্রশাসনিক ভূভাগ হিসাবে ইহা এক ও অভিন্ন। কিন্তু কর্তৃত্বের সীমা বা এখতিয়ারের আয়তন হিসাবে বন ও বসতি অঞ্চল পৃথক। উভয়ের প্রশাসন ভিন্ন। কদাচিতও বন সাধারণ প্রশাসনিক অঞ্চল নয়। ভবিষ্যতে ও এই স্বাতন্ত্র বজায় থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং জননিয়ন্ত্রিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থ অখন্ড আয়তনের বিশাল ভৌগলিক বিভাগ নয়, উহার এক অংশ মাত্র। ৫০৯৩ বর্গমাইল বিশিষ্ট এতদাঞ্চলেরঃ ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল হলো জাতীয় বনাঞ্চল। বাদ বাকি ৪৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র বসতি এলাকা। স্থানীয় প্রশাসনের এখতিয়ার বন ও বসতি নির্বিশেষে সামগ্রিক নয়। উভয়েরই আইন ও কর্তৃপক্ষ ভিন্ন। বন আইন ও সাধারণ প্রশাসনিক আইনের নিয়ন্ত্রণে উভয় অঞ্চল স্বতন্ত্র ভাবেই পরিচালিত। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে উভয়ের আকার আয়তন প্রদর্শিত হলো যথাঃ–

	(ক) কেন্দ্র শাসিত জাতীয় অঞ্চল	বর্গমাইল
১।	উত্তর বন বিভাগ (সংরক্ষিত)	৬১৭ বর্গমাইল
২।	দক্ষিণ বন বিভাগ "	৩১৫ "
৩।	শঙ্খ বনাঞ্চল "	১২৮.২৫ "
৪।	মাতামুহুরী বনাঞ্চল "	১৬০.৭১ "
	(মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চল	১২২০.৯৩ ")
৫।	মুক্ত খাস পাহাড়ী অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল	৩১৬৬.৪০ "
	(মোট বনাঞ্চল	৪৩৮৬.৯৬ ")
৬।	কর্ণফুলী হ্রদ	২৫৬.০০ "
৭।	রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও শিল্পাঞ্চল	১০.০০ "
	মোট জাতীয় অঞ্চল	৪৬৫২.৯৬ "
(খ)	স্থানীয় শাসনভুক্ত বসতি অঞ্চল	৪৪০.০৪ "
	মোট আয়তন	৫০৯৩.০০ "

www.pathagar.com

মূলতঃ অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল সরকারের খাস সম্পত্তি, তবে জেলা প্রশাসকের সাধারণ প্রশাসনিক এখতিয়ারাধীন থাকায় ইহার একাংশ জন নিয়ন্ত্রিত বসতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তবু ইহার বৃহদাংশ খাসই আছে। এ হিসাবে বসতি অঞ্চলের আয়তন আজকাল বেশী। তবু এখনো সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন চতুর্থাংশের অধিক অঞ্চল জাতীয় সম্পত্তিভূক্ত খাস ও সংরক্ষিত। আঞ্চলিক কর্তৃত্বের এখতিয়ার তাতে অনুপস্থিত। এই মর্যাদা বিতর্কিত নয়।

আদিবাসী পাহাড়ী অর্থ স্থানীয় প্রাচীন পশ্চাদপদ বন্য লোক বুঝান হলে, এই সংজ্ঞা স্থানীয় কোন লোকের উপরই প্রযোজ্য নয়। এদের সবাই আধুনিক সভ্যতা গুণের অধিকারী। প্রাপ্ত সর্ব প্রাচীন বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায়, কিছু বাঙ্গালী ও কুকি নামীয় জনগোষ্ঠী মাত্র এখানকার আদিবাসিন্দা পাদবাচ্য। বাংলার চিরকালিন ভৌগোলিক পরিবেশভুক্ত এতদাঞ্চলের বাঙ্গালীমুক্ত থাকা সম্ভব নয়। স্বল্পতম সংখ্যক হলেও কিছু বাঙ্গালীর এতদাঞ্চলে থাকা স্বীকার্য। কুকি আক্রমণের প্রাচীন বিবরণ সমূহে বাজার ও উপত্যকাবাসী বাঙ্গালী উপদ্রুতদের কথা বিবৃত হয়েছে। পাহাড়ী জুমিয়াদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন, তাদের নিকট থেকে সরকারী রাজস্ব আদায়, উপত্যকা সমূহে কৃষিকাজ, বাজার সমূহে পণ্য বেচা কিনা, বনজ দ্রব্যসমূহ আহরণ ও বিক্রি ইত্যাদি কাজে বাঙ্গালীদের সংশ্লিষ্টতা প্রাচীন কাল থেকেই সমর্থিত। তখনকার জুমিয়ারা ছিলো মূলতঃ কুকি সমষ্টিভূক্ত লোক। বহিরাগত অবাঙ্গালীদের দ্বারা তাদের প্রাধান্য হুমকির সম্মুখীন হওয়াতেই তারা আক্রমণ ও প্রতিরোধে লিপ্ত হয়। সে সময়টি হলো বৃটিশ আমলের সূচণা কাল থেকে পরবর্তী শতাব্দী। সুতরাং এখানে বাঙ্গালী ও কুকি বাদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের লোক বহিরাগত। তাদের স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী হওয়া স্বীকার্য নয়। পাহাড়ের অধিবাসী বলে শাব্দিক অর্থে, স্থানীয় প্রত্যেক বাসিন্দাকে পাহাড়ী অভিহিত করা যায়। কিন্তু তাত্বিক অর্থে স্থানীয় অধিকাংশ লোক অপাহাড়ী। এখানে এখন আদিম অনুন্নত লোক থাকলেও বিরল। এখানকার প্রতিটি অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের জাতীয় আবাসভূমি বিদেশে অবস্থিত। সেই আবাস ভূমির সূত্রে,তারা সাধারণ অর্থে পাহাড়ী ও তথাকার আদিবাসী আখ্যায়িত হতে পারে। ত্রিপুরাদের জাতীয় আবাসভূমি ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাইদের মিজোরাম, মার্মা, রাখাইন, মগ, রোহিঙ্গা, মুরং খিয়াং খুমি, সেন্দুজ, দৈংনাক ও থেকদের আরাকান ও বার্মা। চাকমাদেরও পূর্ববর্তী আবাসভূমি আরাকানে থাকা সম্ভব। সুতরাং ইহা ভূল যে উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলি স্থানীয় আদিবাসী ও পাহাড়ী। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান আক্রমণ ও দখলের কারণে এবং পরবর্তী কালের অশান্তির ফলেই তাদের অধিকাংশ স্বদেশ ত্যাগ করে।

www.pathagar.com

এতদাঞ্চলের বাসিন্দা অবাঙ্গালীদের প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সংখ্যা নিয়ে ও বিভ্রান্তি আছে। আদম শুমারী জন সংহতি সমিতির দাবী, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ইত্যাদির সূত্রে সে সংখ্যা দশ থেকে পনেরো। তবে আমার প্রাপ্ত তথ্যে উহা আরো বেশী। ভাষার বিচারে ইহারা দুভাগে বিভক্ত, যথাঃ প্রাচীন ভারতীয় ভাষাভাষী ও তিব্বতী বর্মী সংকর ভাষাভাষী। প্রথম দলভুক্ত হলো ঐ সব সম্প্রদায় যারা নিজস্ব আঞ্চলিক বাংলা, সাওতালী, গাড়োয়ালী মিশ্র আসামী ও নেপালী ভাষায় কথা বলে। দ্বিতীয় দলের ভিতর গারো ত্রিপুরা মিজো ও বর্মীরা অন্তর্ভূক্ত। এদের অধিকাংশ সম্প্রদায় বহু স্বতন্ত্র শাখা সম্প্রদায়ের সমষ্টি। প্রত্যেক শাখা সম্প্রদায়ে গোত্রীয় শাখা প্রশাখা ও বিস্তর। সংখ্যা গত প্রাচুর্য্য আর স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পৃথক করা হলে, সমষ্টি ও সম্প্রদায় গুলির সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

ক) চাকমা সমষ্টিঃ ইহার ভিতর বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠি অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক গোত্র গোষ্ঠি বিভিন্ন শাখা বা গোজায় বিভক্ত। এই সমষ্টির ভিতর সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন উপদল হলো যথাঃ (১) মূল চাকমা (২) টুংটুঙ্গ্যা (৩) দৈংনাক ও (৪) থেক। এখানে উল্লেখ্য যে, অধুনা একটি উপদল চাক নামে আখ্যায়িত হয়, যা আমার মতে থেক বা সেক নামের বিকৃতি।

খ) মগ সমষ্টিঃ অতীতে বর্মী আরাকানী বংশোদ্ভুতদের সামগ্রিক ভাবে মগ বলা হতো। অধুনা তারা নিম্নোক্ত সম্প্রদায় সমূহে বিভক্ত যথাঃ (১) মূল মগ (উপকূলীয় আরাকানী) (২) মারমা (মূলবর্মী) (৩) রোহিঙ্গা (উত্তর আরাকানী) রাখাইন (মধ্য ও দক্ষিণ আরাকানী)।

গ) উপজাতীয় আরাকানী সমষ্টিঃ (১) মুরং (ম্রু ইহার অন্তর্ভূক্ত) (২) খিয়াং (৩) খুমি (৪) সেন্দুজ

ঘ) কুকি সমষ্টিঃ (১) মূল কুকি (২) মিজো (৩) বনযুগী (৪) পাংখো

ঙ) ত্রিপুরা সমষ্টিঃ (১) মূল ত্রিপুরা (২) উসুই (৩) রিয়াং

চ) আসামী সমষ্টিঃ (১) মূল আসামী (২) গারো (৩) মণিপুরী

ছ) আদিবাসীঃ সাওতাল

জ) নেপালীঃ (গুর্খা, লেপচা, থাপা, ইত্যাদি গোত্রসহ)

উপরোক্ত হিসাবে উপজাতি বা অবাঙ্গালীদের সমষ্টি গত সংখ্যা ৮ এবং সম্প্রদায়গত সংখ্যা মোট ২৪।

চাকমা সমষ্টির প্রথম দুই সম্প্রদায় আঞ্চলিক বাংলাভাষী। অবশিষ্ট দুই সম্প্রদায়ের ভাষা মিশ্র বাংলা ও আরাকানী। নেপালী সাওতাল ও আসামীরা মূল ভারতীয় ভাষা

www.pathagar.com

গোষ্ঠীর লোক। বাদ বাকিরা তিব্বতী বর্মী ভাষাভাষী। ত্রিপুরাদের একটি উপদল নিজস্ব আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে। মগদের জ্ঞাতি কিছু সংকর জাতের লোক, অভিনব এক মিশ্র বাংলা ব্যবহার করে, যার ক্রিয়া পদগুলি মধ্যম পুরুষ ভাষী স্থানীয় আঞ্চলিক। এই ব্যতিক্রমগুলি স্থানীয় প্রভাবজাত এবং নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা প্রসূত।

ইহা সঠিক নয় যে, স্থানীয় অবাঙ্গালীদের সামগ্রিক পরিচয় জুমিয়া। জুম চাষ হলো একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত পেশা। এতদাঞ্চলে এখনো উহার কিছু চর্চা হয়ে থাকে। তবে জুম চাষীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এ কারণে জুম খাজনা আদায়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানঃ তিন উপজাতীয় সর্দার পরিচালিত পুন্যাহ, আজকাল প্রায় পরিত্যক্ত। জুমিয়া মানে ক্ষুৎ পিপাসা কাতর অর্ধ উলঙ্গ অশিক্ষিত বনবাসী যাযাবর মানুষ, যাদের জীবন যাপনের বাহন হলোঃ আদিমতা। সভ্যতা গর্বে গর্বিত অবাঙ্গালীদের উন্নত জীবন মান, জুম সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইহা তাদের পরিচয়ের সূত্র হওয়ার অযোগ্য। অবশ্য এতদাঞ্চলের প্রাচীন জুম বঙ্গ নামটি গ্রহণ যোগ্য। কারো কারো অভিমত হলোঃ কুকি নামের কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। আজকাল কেহই নিজেদের কুকি পরিচয় দেয় না, সুতরাং অতীতে ও কুকি নামের লোকজনের থাকা সন্দেহ জনক। ঠিক একই ভাবে কেহই নিজেদের মগ স্বীকার করে না। মগ অভিহিতরা নিজেদের মার্মা আখ্যায়িত করে। সুতরাং এ নামটি ও অতিরিক্ত। অন্য কেউ কেউ মনে করেন মুরুংরা একটি ত্রিপুরা শাখা এবং ম্রু গণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এ দাবী গুলি সঠিক হলে, মোট সম্প্রদায় সংখ্যা একটি কমে তেইশে পরিণত হয়। কিন্তু আমার নিজস্ব অভিমত হলোঃ অতীত ইতিহাসে কুকিরা মানুষের মুণ্ড শিকারী, আর মগেরা দস্যু আখ্যায়িত হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট সচেতন লোকেরা আজকাল ঐ নাম গুলিতে নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত। এতেই নাম গুলির ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে। বাস্তবে অনুরূপ সম্প্রদায় ছিলো এবং আছে। রোহিঙ্গা নামে পরিচিত আরাকানীরাও জন্ম সূত্র, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কারণে তিন ভাগে বিভক্ত। মঙ্গোলীয় শ্রেণীর রোহিঙ্গা গণ মুসলিম ও বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ভিন্ন ভাষী ভারতী আর পশ্চিমাদের মুসলিম বংশধরগণ জেরবাদী নামে আখ্যায়িত। এদের অধিকাংশের ভাষাঃ আরবী ও ফার্সি মিশ্রিত চট্টগ্রামী ও স্থানীয় আরাকানী বাংলা। উপরোক্ত আলোচনায় বৌদ্ধ রোহিঙ্গাদের মগ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মঙ্গোলীয় শ্রেণীর মুসলিমদের রোহিঙ্গাদের অন্তর্গত করে ধরা হয়েছে। অমঙ্গোলীয় মুসলিম জেরবাদীদের কিছু লোক বান্দরবানের অন্তর্গত অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে আছে। তারা অবাঙ্গালী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত নয়। এই নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি শুধু স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোকদের নিয়েই

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ। আলোচনায় প্রমাণিত হয় স্থানীয় অবাঙ্গালী তথা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোকদের প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সংখ্যা অনেক বেশী, এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ক্ষুদ্র একদল মঙ্গোলীয় মুসলিমের ও অস্তিত্ব আছে।

(জুন ১৯৯২ ইং)

www.pathagar.com

পর্বতাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি সার্বজনিনভাবে বহুল আকাংখিত। তবু উহা সহজ প্রাপ্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে সম্পূর্ণ আস্থার সাথে বলা যায় হাঁ, অবশ্যই। অব্যাহত বিরূপ পরিস্থিতির শিকার ও হতাশাগ্রস্ত অনেকের কাছে, শান্তি দুষ্প্রাপ্য ও দুরূহ মনে হবে, কিন্তু তাতেও আশাহত হওয়া ঠিক নয়। ভূল ত্রুটি স্বীকার ও সদিচ্ছার বশবর্তী হলে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজ আর নমনীয় করে তোলা যায়। এতদাঞ্চলীয় রাজনৈতিক সংকট অসমাধ্য নয়। তাই আন্তরিকতার সাথেই সংকটের সমাধান ও শান্তির কামনা করা চাই। সংশ্লিষ্ট সবাই সমাধান ও শান্তির জন্য উদগ্রীব হলে, অসাধ্য সাধন সম্ভব। শুধু আগ্রহ আর সদিচ্ছা থাকাই যথেষ্ট নয়। সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রথমেই যুক্তির মাধ্যমে জনমত গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। পক্ষ বিপক্ষের কাছে ব্যাপক ভাবে যুক্তি তুলে ধরা দরকার। অনুকূল আগ্রহ সৃষ্টি ও আস্থা অর্জনের এই অব্যাহত প্রক্রিয়ায়, প্রতিকূলতার বাধা, ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে বাধ্য। এভাবে একটি অনুকুল ও আস্থাশীল পরিবেশ রচনা সম্ভব। সরকারী–বেসরকারী উদ্যোগ একত্রিত হলে, এই শান্তি আন্দোলন অধিক জোরদার হবে। পুর্ব নির্ধারিত বিরূপ ধারণা ঝেড়ে মুছে, ভূল ত্রুটি স্বীকার করে, নতুন উদার দৃষ্টি ভঙ্গীতে, মন ও মেজাজকে প্রস্তুত করা না গেলে, উদ্যোগ গতিশীল হবে না। উদার ভাবে ভেবে দেখতে হবে, সংকটের গতি প্রকৃতি কি এবং তার দায় ভাগ পক্ষে বিপক্ষে কার কতটুকু। শুধুই বিপক্ষের উপর দোষারোপ ও নতি স্বীকার না করার স্বপক্ষীয় একগোয়েমী, মীমাংসার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। শান্তির অন্বেষায় খোঁজে দেখা দরকার মিল আর অমিলের কারণ কি কি? অমিল গুলিকে ঘষা মাজার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রাজনৈতিক অমিল আর সংকট দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যম ছাড়া সহসা মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। তাই ব্যর্থতায় হতাশ হলে হবে না। হতাশায় চরম সিদ্ধান্ত নেওয়াও অনুচিত। জাতীয় আকাংখার সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে গ্রহণ বর্জনের দ্বারা আঞ্চলিক আকাংখা পুরণকে সম্ভব করে তুলতে হবে। তখন মীমাংসা সুদুর পরাহত থাকবে না।

এ যাবৎ দুই প্রতি পক্ষ বহু রক্তপাত ঘটিয়েছেন। উভয় পক্ষে বহু ভূল ত্রুটি হয়েছে। হিংসায়, বিভেদে, সারা পর্বতাঞ্চল নরক কুণ্ডে পরিনত। মানবিক মূল্য

www.pathagar.com

বোধ ও দরদ নির্বাসিত। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নিরিহ সাধারণ লোকের অগণিত জান মাল ও ইজ্জত খোয়া গেছে। অব্যাহত হিংসা ও বিভেদের দ্বারা সমস্যার সমাধান বা উপকার হয় নি। উভয় পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি আর দুঃখই বেড়েছে। এবার সে ব্যর্থতাকে অবলম্বন করে তার কার্য কারণ খুঁজে দেখতে হবে। তাতে নিশ্চিত হওয়া যাবেঃ হিংসা ও বিভেদে শান্তি নেই। অস্ত্র কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। তাতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি বাড়ে।

পর্বতবাসী জনসাধারণ ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই, মনে প্রাণে এমন একটি পরিবেশ কামনা করে, যেখানে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষ নেই। হিংসা ও সন্দেহ প্রবনতার দ্বারা কেউ কাউকে শত্রু মূল্যায়ন করে না। নির্দ্বিধায় সর্বত্র যাতায়াত, বসবাস ও জীবন যাপন করা যায়। পেশা ও ব্যবসা, বাধা বিপত্তিহীন। নিষেধ, বাধা, তালাসি, তদন্ত, ভয় ও নিরাপত্তার কড়াকড়ির দ্বারা জীবন ও জীবিকার তৎপরতা প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ নয়। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি গুলি পারস্পরিক হিংসা ও সংঘর্ষের সৃষ্ট প্রতিফল।

মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে জন কল্যাণ হয় না। সাময়িক দুঃখ দুর্দশা সহ্য হয়। কিন্তু স্থায়ী উপদ্রবকে কখনই মান্য করা যায় না। অধিকার আদায়ের নামে স্থায়ী ধ্বংসের ভিতর আবদ্ধ থাকা রাজনীতি হতে পারে না। সারাক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী ভাবে দৈনন্দিন জীবনকে বিপন্ন রাখা, আর চলমানতাকে স্তব্ধ করে দেওয়া মহা বিরক্তিকর। মানুষের নামে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বা যুদ্ধে, সে মানুষই উপদ্রুত আর জিম্মি হলে, তা আকাংখিত থাকে না। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম বা যুদ্ধ গণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি করে। তাই তারা সে সংগ্রাম বা যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ এই পর্যায়ে উপনীত। এখন হিংসার অবসান ও সংঘাত বিরতির দরকার। আজ মানবতার নামে অস্ত্রধারীদের প্রতি দোহাই ঃ দয়া করে আপনারা বিরত হোন। দীর্ঘ স্থায়ী উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ট।

অস্ত্রে নয় মুখোমুখী আলোচনায় মীমাংসা সম্ভব। জাতীয় রাজনৈতিক আকাংখার সাথে পর্বতবাসী সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক আকাংখার সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য নয়। উভয় পক্ষ বাস্তবতার নিরিখে নমনীয় হলে, সমঝোতা অবশ্যম্ভাবী। অস্ত্র টেবিলে রেখে, মিলিটারী মিজাজে শান্তির সন্ধান, অপপ্রয়াস মাত্র। বেসামরিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই কাজ সমঝোতা ও সংহতি রচনা। রাজনৈতিক অঙ্গনে, গ্রহণ বর্জন ও ছাড় দেওয়ার মাঝেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা কঠিন কাজ নয়। রাজনীতি কঠিন ও ভঙ্গুর নয়–নমনীয়।

www.pathagar.com

বিপক্ষকে ভেবে দেখা দরকার, বাঙ্গালীদের সহ্য করতে না পারা ও তাদের অধিকার অস্বীকার করা বাস্তব সম্মত কাজ নয়। সারা দেশে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। সমুদয় জন সংখ্যার ৯৯% তারাই। দেশের সীমান্তে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলে অবাঙ্গালী সংখ্যা লঘুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলে যৌগিক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও, সারা দেশের বাঙ্গালীদের তুলনায় তারা এক শতাংশের আধা জন মাত্র। স্থানীয় ভাবেও বাঙ্গালীরা একক প্রধান সম্প্রদায়ে পরিনত হয়ে গেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির অনুকুল। তাদের কয়েক কোটি লোক ভূমিহীন। উক্ত ভাসমান লোকের স্রোত ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। নগরী গুলি তাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। সারা দেশের পথ ঘাট, হাট বাজার, মাঠ ময়দান তাদের দ্বারা প্লাবিত। কোন আইন ও বাধা নিষেধের দ্বারা ঐ জনস্রোত ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। ইহা তাদের জন্মস্থান ও স্বদেশভূমি। এদেশে তাদের ভৌমিক অধিকার প্রাপ্য। ভূমিহীন বলে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট নয়, তবে উহা নীতিগত সর্বব্যাপ্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামকেও তাদের উপদ্রব সইতে হবে। ইহা অভিন্ন ভাবে সার। দেশের নিয়তি। তবে অবাধ বাঙ্গালী জনস্রোত সম্ভব পর্যায়ে ঠেকিয়ে রাখা আবশ্যক। নতুবা স্থানীয় সংখ্যা লঘুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগের দ্বারা এতদাঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত করা যাবে না। ঘন ঘন তুফান ও জলোচ্ছাসের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী নিহত হলেও বঙ্গোপসাগরের দীপাঞ্চল বাঙ্গালী মুক্ত হয় নি । বৃটিশ আমল থেকে বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন নৃশংস ভাবে পরিচালিত হলেও আসামে এখনো বাঙ্গালী টিকে আছে। আরাকানের বাঙ্গালীরা সে দেশে বহু নৃশংসতার শিকার হলেও সেখান থেকে উৎখাত হয় নি । জন্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে বৎসরে পঁচিশ লক্ষাধিক বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। স্বদেশভূমির একাংশে তাদের রক্তপাত, সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ঘটাবে, এবং তাদের সংখ্যা তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াও অসম্ভব। হিংসা প্রতিহিংসারই জন্ম দিবে। দেখাদেখি বাঙ্গালীদের ও অস্ত্র বাজিতে অভ্যস্ত হওয়া অসম্ভব নয়। তারা আত্মরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনে তাই করতে বাধ্য হবে। তখন হানাহানির পরিবেশে, বাঙ্গালী আরেক বাঙ্গালীর দ্বারা, এবং অবাঙ্গালী লোকজন তাদের আপনজনদের হাতে নিগৃহিত হবে। সুতরাং সেই সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে আগে ভাগেই শামাল দেওয়া দরকার। আর যেন কোন বাহিনী না বাড়ে সেই প্রয়োজনে প্রচলিতবাহিনী গুলিকে নিজ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই ধারণা বাস্তব সম্মত নয় যে, কারো দাবী বা অস্ত্রের মুখে সরকারী বাহিনী গুলি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে। তাদের দায়িত্ব চিরাচরিত দেশ

www.pathagar.com

রক্ষা ও শান্তি শৃংখলা বিধান। এখানে বহুল সংখ্যায় বাঙ্গালীর থাকা ও প্রতিরক্ষার অংশ। সুতরাং এই অপ্রিয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল।

ইহা ও সঠিক নয় যে, অবাঙ্গালীদের দাবী দাওয়া সবই অন্যায়। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তাদের এ আশংকা থাকা স্বাভাবিক যে রেড ইন্ডিয়ান, পাপুয়ান ও অন্যান্য আদিবাসীদের মত তাদের অস্তিত্ব সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীদের হাতে হুমকীর সম্মুখীন। তাদের এই আশংকা ও সন্দেহের প্রতিকারে আস্থাসূচক রক্ষা কবচ দেওয়া ছাড়া শুধু আশ্বাস আর ওয়াদা প্রদান যথেষ্ট নয়। বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রণ নয়, উপজাতীয় অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই মুল বিষয়। তা না হলে, বহিরাঞ্চলে থেকেও তাদের ক্ষতি করা যাবে। স্বায়ত্তশাসনের দাবী অসমাধ্য নয়। ইহা সারা দেশের রাজনৈতিক আকাংখার অংশ। সংবিধানে ইহার সুযোগ থাকা না থাকা বড় কথা নয়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জাতি একমত হলে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা হবে। ইহা জাতীয় সম্মতি সাপেক্ষ। এজন্যে রক্তপাত নিরর্থক। সংবিধানসম্মত নয়, তাই বলে স্বায়ত্তশাসনের দাবী অন্যায় নয়। স্বায়ত্বশাসন দিলেও তাতে বাঙ্গালীরা বৃহৎ অংশীদার হয়ে থাকবে; এবং এখানকার শান্তি শৃংখলা ও প্রতিরক্ষায় সরকারী বাহিনী গুলি নিষ্ক্রিয় হবে না। স্বায়ত্তশাসনের অর্থ অবশ্যই ইহা নয় যে, বিদ্রোহীদের হাতে সব নিয়ন্ত্রণভার ছেড়ে উপজাতীয় বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে দিয়ে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে যাওয়া। দাবীকৃত স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা ও ব্যাখ্যায় এখনো এমন গুরুতর কিছু উপস্থাপিত হয় নি , যা মঞ্জুর করা অপরিহার্য, এবং দুশ্চিতার বিষয়। আপাতঃ উত্থাপিত বিরোধীয় বিষয় গুলির যুক্তিসঙ্গত আলোচনা হতে পারে, যদ্বারা উভয় পক্ষই নীতিগতভাবে আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প বলে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এর পক্ষে বিপক্ষে স্থানীয় ভাবে জনমত যাচাই হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত ইহা বিতর্কিতই থাকবে। তবে জনমত যাচাইকে সরকারী ও বেসরকারী চাপমুক্ত রাখা বড় কঠিন। সরকারী ও বেসরকারী বাহিনীগুলি এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় আর নিরপেক্ষ নাহলে যথার্থভাবে জনমত প্রতিফলিত হবে না। সরকারী বাহিনীগুলির কার্যতঃ এ ব্যাপারে কোন স্বার্থ নেই, সুতরাং একমাত্র শান্তিবাহিনীকেই ভয়। তাদের নিরস্ত্র তৎপরতা ক্ষতিকর বিবেচিত নয়। স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে বেসামরিক পর্যায়ে সবারই জনমত গঠনে ভূমিকা রাখার অধিকার স্বীকার্য। বলা যায় স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন এমনিতেই সংবিধান বিরোধী। সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলে তা টিকা কঠিন। কারণ সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণবাদী নির্বাচন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রদায় ভেদে সুযোগ সুবিধার তারতম্য তাতে স্বীকৃত নয়। অথচ স্থানীয় সরকার পরিষদ

www.pathagar.com

আইনে বাঙ্গালীদের পক্ষে চেয়ারম্যান হওয়া নিষিদ্ধ, এবং সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের বাহিরে বৈষম্য আরোপিত হয়।

রাজনৈতিক কারণে শান্তি বাহিনীকে দুষ্কৃতিকারী বলা যায় না। এই সংগঠনটি বেআইনী অস্ত্রবাজ হলেও, নিজেদের সমাজ স্বজন ও জন্মস্থানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ। বিরোধীতার প্রশ্নে তাদের সাথে সমঝোতা সম্ভব্ হলে তারা স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষে সাহসী ভূমিকা রাখার যোগ্য। তখন তাদেরকে যোগ্যতানুসারে সরকারী বাহিনী গুলিতে আত্মস্থ্ করাও যাবে। জনসংহতি সমিতির নেতাদের ও স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব মূলক পদে মনোনীত করে তাদের সেবা গ্রহণ করা যায়। ওদের পুনর্বাসনের সম্মানজনক ব্যবস্থা ইহাই হতে পারে।

(জানুয়ারী ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

শান্তি সম্প্রীতি পরিবেশঃ

দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত। এখানে উত্তাপ উত্তেজনা আর আতঙ্ক ছাড়া শান্তি প্রায় দুর্লভ। যাতায়াত, বসবাস, পেশা, ব্যবসা ইত্যাদি কিছুই নিরূপদ্রব নয়। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রত্যেকেরই জীবন ও জীবিকা প্রায় বিপন্ন। প্রত্যেকেই পরস্পরকে গা বাঁচিয়ে চলে। যেন তারা একে অন্যের অঘোষিত শত্রু। কেউ কারো কাছে নিরাপদ নয়। পারত পক্ষে কেউ কারো কাবুতে যেতে চায় না। পরস্পরের প্রতি ভীতি আর অবিশ্বাস, অন্তরের গভীরে প্রথিত। রোজ প্রতিক্ষণ হানাহানি না হলেও কোথায় ও শান্তি ও স্থিতির পরিবেশ বিরাজিত নেই। এই পরিস্থিতিটা দুর্ভাগ্যজনক। হিংসা আর বিভেদের মনোভাবকে, এই পরিস্থিতিটাই লালন করছে। ইহা অবাঞ্ছিত।

না চাইলেও পরিস্থিতি সবাইকে গ্রাস করছে। মানুষের অহিংস শান্তির কামনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। চীৎকার সহকারে সবাই জানাতে চায়ঃ ভুল হচ্ছে। ভুলের মাশুল আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবেক-বোধ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। আদিম বর্বরতা, উন্নয়ন ও সভ্যতার বাহন হতে পারে না। আমাদের অনুরূপ আকাংখা পুরণ হবার নয়। এক দেশ ও জাতির গর্বিত সন্তানদের পারস্পরিক হিংসা ও বিভেদ অনুচিত। তা ভুলে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতিকে প্রতিবেশীত্বের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া জীবন ও জীবিকা স্বাভাবিক হবে না।

সুধী ও সাধু জনেরা নিরূপদ্রব জীবন কামনা করেন। নিরিহ সাধারণ লোকজন উপদ্রবকে ঘৃণা করেন। আমাদের নূতন প্রজন্মের অবুঝ সদস্যরা তাদের বেড়ে উঠা ও গড়ে উঠার জন্য চায় সুখী শান্ত পরিবেশ। আমরা যেন উত্তরাধিকার সূত্রে, এই পরিবেশ, হিংসা ও বিভেদের আবহাওয়া রেখে ভাবী বংশধরদের, তাতে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ রেখে না যাই। অন্যতায় তা হবে মানব জাতির বিরুদ্ধে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক মহা অপরাধ।

চিরকাল হিংসা হানাহানি আর বিভেদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্র শক্তির অধীনে, বিভিন্ন বাহিনী পোষণের প্রয়োজন হয়, যা কখনো কোথাও তিক্ততার উন্মেষ ঘটায়। মূলতঃ সমাজই সে হানাহানি ও তিক্ততার জন্য দায়ী। বাস্তব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে অগণিত প্রাণ হানি, অপরিমিত রক্ত পাত, বিপুল আহতের আহাজারি, অসংখ্য বাড়ীঘর ও সম্পদের বিনাশ, সীমাহীন, দুর্দশা, দুর্ভোগ, আর বাস্তুত্যাগ, সহনীয় কাজ নয়। এই অবাঞ্ছিত ধ্বংসযজ্ঞ কোন সাফল্যই বয়ে আনে নি। যে সব দাবী দাওয়া আমাদের অনেককে বিক্ষুব্ধ করেছিলো, তার কিছুই অর্জিত হয় নি। ব্যর্থতার ভিতর শুধু ক্ষোভ ও সংঘাতের অনুশীলনই চলছে। দিনে দিনে বাড়ছে শুধু দুঃখ দুর্দশা ও ক্ষতি। এখন সে ব্যর্থতাকে হিসাব করা দরকার। আতকে উঠার মত যথেষ্ট হয়েছে। এবার ক্ষ্যান্ত দেওয়া আবশ্যক। আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধে সীমাহীন মূল্য দেওয়া হয়ে গেছে। জান মাল ও ইজ্জতের এত চড়া মূল্যে রাজনীতির বাজি ধরা অনুচিত। নিশ্চিত বিপুল ক্ষয় ক্ষতিকে পুষিয়ে নিবার দুরাশায়, যোদ্ধামান দুই প্রতি পক্ষের হুশ হওয়া জরুরী। ভুল স্বীকার করা আবশ্যক। আর হিংসা হানাহানি নয়। অস্ত্র দূরে রেখে, আলিঙ্গনের মাধ্যমে পরস্পরকে বুকে নিয়ে সর্বাগ্রে পরিবেশকে স্বাভাবিক করে নিতে হবে। অস্ত্র কোন দিনই দুষ্প্রাপ্য নয়। সহসাই রক্তপাত ও হানাহানি লাগান যায়। কিন্তু শান্তি ও সুস্থিতি অর্জন বড় কঠিন। উন্নয়ন ও সভ্যতার পক্ষে শান্তি আর সুস্থিতি অপরিহার্য। অস্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞে, কিছু গড়ে উঠেনা। তদ্বারা অর্জিত হার জিত ও স্থায়ী হয় না। কিন্তু শান্তিতে অর্জিত জ্ঞান ও সম্পদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। তাকে দমান যায় না। আলোচনার টেবিলে জ্ঞানের জয় অবশ্যম্ভাবী। যা অস্ত্রের দ্বারা অর্জন সম্ভব, তা আলোচনার মাধ্যমে লাভ করা যাবে না, সে পূর্ব-ধারণা পোষণ অনুচিত। আমার দাবী হুবহু পেতে হবে, এরূপ এক গোয়েমীতে ও যুক্তি নিহিত নেই। পেতে হবে, ছাড়তে হবে, জাতীয় আকাংখার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে; মন মানসিকতাকে এরূপ নমনীয় না করলে হবে না। এখানে খোয়াবার কিছুই নেই। দিবো আর নিবো, মিলবো ও মিলাবো, তফাৎ এতটুকুই মাত্র।

যে বিরোধ ও তফাতের জন্য আমরা ভাইয়েরা আজ পরস্পরের শত্রু, বাস্তবে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব। ত্যাগ ও লেনদেনের উদার মনোভাবে সমাধান আকাংখিত হলে, সমস্যাটি অসমাধ্য কঠিন নয়। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত আলাপ আলোচনা ও ব্যয়িত সময়ের দ্বারা গড়ে উঠা সমঝোতার মাধ্যমে, বিরোধের পরিধি, অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। সহ্য ধৈর্য্য আর যুক্তিকে কাজে লাগান হলে, আরো সাফল্য অর্জিত হবে এ সম্ভাবনা আছে।

রাজনৈতিক বিরোধাবলী মীমাংসায়, এক গোয়েমী পরিত্যাজ্য; এবং অস্ত্রের স্থান চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে নয়। আমরা এই উভয় পন্থারই যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। যুক্তিকে আগে স্থান দিতে হবে এবং এখনো সে সুযোগ ফুরিয়ে যায় নি। তিক্ত অভিজ্ঞতাকে অগ্রযাত্রার পাথেয় করা দরকার।

www.pathagar.com

এখানকার অবাঙ্গালীদের জাতীয়তা রাষ্ট্র ভিত্তিক হওয়াই সঙ্গত। বাঙ্গালী জাতীয়তায় তাদের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। সংখ্যাগত স্বল্পতার কারণে কিছু অবহেলা প্রাপ্য বলে, সত্তরের দশকের প্রারম্ভে তাদের উপর যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তার বিপরীতে তাদের প্রচন্ড বিদ্রোহ, সেই অবহেলাকে ভুল প্রমানিত করেছে। তারা প্রমাণ করেছে সেই মূল্যায়ণ যথার্থ ছিলোনা। হিসাবে সংখ্যালঘু হলেও গোটা দেশের এক দশমাংশ অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য বিদ্যমান। তদুপুরি এতদাঞ্চল এমন এক নাজুক সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত, যার বিপরীতে পরপারে সমগোত্রীয় জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ; যারা স্বভাবতই স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার অধিকারী। সুতরাং পরিবেশগত কারণে ও স্থানীয় সংখ্যালঘুরা, এদেশের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক। সারা দেশের মত এতদাঞ্চলকেও বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চলে পরিণত করা হলে, সন্দেহ আর উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এযাবৎ তাই হয়েছে। আগামীর জন্য ইহা এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। ইহা ছাড়াও বিবেচ্য যে, এতদাঞ্চলে জনঘনত্ব পাতল হলেও, ইহার ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা এখানকার প্রাণী জীবন ও প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখা দেওয়া সম্ভব। বস্তুতঃপক্ষে এই পাহাড়ী ভূমির ধারণ ক্ষমতা সমতলের সমান নয়। ইহার খাড়া ঢাল, সংকীর্ণ খাদ ও সরু চুড়া, বসবাসের পক্ষে পতিকূল। ক্ষেত খামার ফল ফসলের পক্ষে ইহা উপযোগী হলেও, প্রধান খাদ্য ধান ও গম উৎপাদনে, সংকীর্ণ খাদ ও উপত্যকাই মাত্র ব্যবহারযোগ্য। সুতরাং জনসংখ্যার খাদ্য যোগান–ক্ষমতা, পাহাড়ী ভূমির অপেক্ষাকৃত কম। বর্ষণ ও সেচ কাজের অসুবিধাও বেশী। বর্ষা কালের বৃষ্টির একমাত্র অবলম্বনের কারণে সীমিত–কৃষি–ভূমিতে এক ফসলই মাত্র উৎপাদন সম্ভব। সুতরাং জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলে, তাদের গৃহ সংস্থান ও ফসল ভূমির চাহিদা মিটাতে, বন সংকোচনের আবশ্যক হবে। যে চাহিদা কোন সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। অনাবাদী পাহাড় ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল মিলে, লোকবসতির অনুপাত সারাদেশের তুলনায় অল্প, কিন্তু কৃষি ও বসতোপযোগী জায়গার হিসাবে জনবসতি মোটেও পাতল নয়। ভূমির ধারণ ক্ষমতার হিসাব না করে, শুধু ভূমিহীন পুনর্বাসন, আর সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনে, বসতি বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলে, স্থানীয়ভাবে জীবিকার সংস্থান ও বাসস্থানের সংকট দেখা দিবে। জনসংখ্যার চাপের প্রতিক্রিয়ায় বনবাদাড় ও বৃক্ষ সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে। প্রয়োজনীয় বনজ দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি হবে। বন্য পশু পাখী জন্তু জানোয়ার আশ্রয়হীন এবং তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। আবহাওয়া ভারসাম্যতা ও প্রকৃতিগত গুণ হারাবে। পরিবেশ হয়ে পড়বে জীবন ও জীবিকার পক্ষে অনুপযোগী। অক্সিজেনের অভাবে বিষবাষ্পের আধিক্য দেখা দিবে। আদ্রতার অভাবে প্রকৃতিতে শুষ্ক মরু

www.pathagar.com

প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অনিয়ম দেখা দিবে ঋতুর আবর্তনে। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে আবহাওযায পরিলক্ষিত হবে বিরাট পরিবর্তন। অতএব এখানে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রযোজনেও বটে, জনসংখ্যার বিরাট বৃদ্ধি ঘটান ক্ষতিকর। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জনসংখ্যার অপ্রাকৃতিক বৃদ্ধি রোধের দ্বারা, প্রকৃতির ক্ষতিকর প্রবনতাকে শামাল দেওয়াও আবশ্যক।

বিরোধের অপর কার্যকারণ জমি জমার বিরোধ একটি কৃত্রিম সমস্যা। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে, উহার নিবারণে উদ্যোগ নিলে সহজেই মীমাংসায় পৌছা যায়। মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জরিপ কর্মচারীদের দ্বারা স্থানীয় সংখ্যালঘুদের আবাদকৃত অনেক জমি সরকারী খাস রেকর্ডের ভিত্তিতে নবাগত বাঙ্গালীদের বরাদ্দ করা হয়েছে। এ জাতীয় বিরোধের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে বিরোধাবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের আপোষ অথবা প্রতিদানের দ্বারা বিরোধের নিষ্পত্তি করা কঠিন নয়। আবাদকৃত জমি সে খাসই হোক, বন্দোবস্তির বেলায় ন্যায়তঃ আবাদকারীর প্রাপ্য। তবে বন্দোবস্তি না নেওয়ার খেসারত ও তাকে দিতে হবে, যা পর হস্তে চলে যাওয়ায় তাকে ভুগতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নুতন মালিক থেকে ঐ জমি উদ্ধারও কঠিন হবে। কারণ ইতিমধ্যে তার মালিকানা পাকা পোক্ত হয়ে গেছে; এবং খাস বলে সরকারীভাবে ঐ জায়গা তাকে বন্দোবস্তি দিয়ে হস্তান্তর করাও হয়েছে। সে ব্যক্তিগতভাবে বেআইনী ভোগদখলকার নয়। অনেক জায়গায় সংখ্যালঘু পরিবেশও নেই। সুতরাং বিকল্প জায়গাজমির মাধ্যমে, অনেকক্ষেত্রে সান্ত্বনা পেতে হবে। জিদ ও জিঘাংসাকে প্রশমিত করা এসব ক্ষেত্রে একান্তই উচিত।

সামাজিক অশান্তি সৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক, আর আর্থিক লেন দেন কম দায়ী নয়। এসব ব্যাপারে সামাজিক কঠোরতা আর যৌথ সালিবী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা দরকার। কেউ যেন জবরদস্তি বা সামাজিক সম্মতি ছাড়া কোন রূপ যৌন সম্পর্ক রচনায় সফলকাম না হয়, এবং কোনরূপ অনাচার না ঘটায়, এরূপ সামাজিক বিধি নিষেধ রচনা ও চালু করা, এবং তজ্জন্য সালিষ কর্তৃপক্ষ থাকা আবশ্যক। স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মাঝে প্রচলিত সামাজিক বিচার পদ্ধতির আদলে, আন্তঃ সামাজিক বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তৎপ্রতি সরকারী অনুমোদন থাকার প্রয়োজন হবে। সামাজিকভাবে কঠোরতার দ্বারা অবাঞ্ছিত যৌন সম্পর্কের ঘটনা আর অবৈধ লেনদেনের প্রতি লোকজনকে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব।

সামাজিকভাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধযোগ্য অন্যায় অনাচারের প্রতিটি ঘটনায়, সমাজপতিদের বিচার ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতা দিলে, ধীরে ধীরে উত্তেজনাহীন

www.pathagar.com

আন্তঃসামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠার সুযোগ হবে। মন ও মানসিকতাকে অহিংস ও বন্ধুভাবাপন্ন করে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপই হলো বিপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন না করা। তার স্বার্থহানি থেকে বিরত থাকা। এবং ব্যবহারে হওয়া সহিষ্ণু ও ভদ্র। ন্যায় অন্যায়ের মূল্যায়ণে আপনপরে তারতম্য আর পক্ষপাতিত্ব মোটেও প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। এরূপ উদার আচরণের দীর্ঘ অনুশীলন পার্বত্য আবহাওয়াকে ভারসাম্যময় করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধীয় বিষয়গুলি এড়ান ও নিবারণ করা গেলে, একটি সদ্ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হওযা সম্পূর্ণ সম্ভব। সেরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য আশা আকাংখার পার্থক্য ক্রমে সঙ্কোচিত হয়ে উভয় সমাজই সমন্বয়ের দিকে এগুবে। তখন দেখা যাবে সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় ক্ষেত্রে অপসারিত, এবং উভয় সমাজের চাওয়া পাওয়ার দাবীতে প্রায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ক্ষমতা আর সুযোগ সুবিধায় একের বঞ্চনায় অপরের প্রাপ্তি যোগ না হলে, এবং ন্যায্য শরীকী ধারার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলে সম্মিলিত চেষ্টায় জাতি ও রাষ্ট্রের কাছে কিছুই অপূরণীয় থাকবে না। যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জনের চেষ্টায় একা সংখ্যালঘু সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের সমুদয় ব্যর্থতা, স্থানীয় বাঙ্গালীদের সহায়তায় অচিরেই সাফল্যে পরিণত হওয়া সম্ভব। তাই দরকার কৌশলের পরিবর্তন। স্থানীয় বাঙ্গালীদের দলভুক্ত করে যদি দাবী করা যায়ঃ যথেষ্ট হয়েছে, আর বাঙ্গালী পূনর্বাসন নয়, এবং জনসংখ্যানুপাতে গণতান্ত্রিক নিয়মে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করা সহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, তা'হলে উহা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে। এর মোকাবেলায় অস্ত্র তুচ্ছ। এ বস্তুটা পরিত্যক্ত হওয়া দরকার।

এদাঞ্চলের অবাঙ্গালী জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী, কথায় ও অস্ত্রের সাহায্যে একযোগে প্রচন্ড আকারে যে রাজনৈতিক আকাংখা ব্যক্ত করে চলেছে, তা দেশে বিদেশে আলোড়ণ সৃষ্টি করেছে। ভারতে শরণার্থী হিসাবে তাদের কিছু লোক আশ্রিত থেকে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার পর্যায়ে উন্নীত করে নিয়েছে। ইহা একা বাংলাদেশের পক্ষেই শুধু বিরক্তিকর নয়, দুর্ভোগের বিচারে খোদ ঐ অবাঙ্গালী শাণার্থীদের পক্ষেও চরম বিপর্যয়কর। রাষ্ট্র এবং অবাঙ্গালীদের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। দুর্ভোগ ও বিপর্যয়কর এই পরিস্থিতি বজায় রাখার দ্বারা কেউ উপকৃত হচ্ছেনা। চিন্তাশীল ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বুঝতে অসুবিধা হবার নয় যে, সমস্যা জিইয়ে রাখার চেয়ে তার আপোষমূলক সমাধানই উত্তম। বিপরীতমুখী একরোখা মনোভাব ক্ষতিকর। দেশ ও জাতির পক্ষে মৌলিক

www.pathagar.com

জৈবিক চাহিদাগুলিও পূর্ণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয় নি। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক ও উন্নয়ণমূলক দাবী দাওয়া অপূর্ণ থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের পরস্পরের উপর প্রতিশোধ ও হিংসায় মেতে উঠাও সঙ্গত নয়। কেউ কাউকে বঞ্চিত করছিনা–সবাই বঞ্চিত। দোষ এককভাবে কারো নয়–দোষ ভাগ্যের। কিছু অন্যায় অবিচার আর হেরফের হওয়া স্বাভাবিক। দুর্বল আর সংখ্যালঘুদের প্রতি কিছু অবিচার হওয়া অসম্ভব নয় এবং তজ্জন্য হানাহানি ঘটা বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতারই অংশ। ইহা যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘটানোর মত চরম ঘটনা নয়, কার্যতঃ পারিবারিক বিরোধ। ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করে, মিট মাটের কথা ভাবা উচিত।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতিতে সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়, জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে অবাঙ্গালী জনসাধারণকে বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দানের জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। পরে জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সমথূন জানিয়ে তদ্বারা স্থানীয় পার্বত্য জনগণের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সাথে দাবী করা হয়েছে যে পার্বত্য শরণার্থীদের ত্রিপুরা থেকে ফেরত এনে নির্বাচনে শরীক হবার সুযোগ দেওয়া সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলার তিন সংসদীয় আসনের নির্বাচন যেন সাময়িক স্থগিত রাখা হয়। ইহা ইতিবাচক ও নিরস্ত্র রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই অনুকূল মনোভাবের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত হওয়া উচিত।

উপজাতীয় দাবীতে আতিশয্য থাকা সম্ভব। সহসা চূড়ান্ত পর্যায় থেকে নিম্নতম নমনীয়তায় নেমে আসা এবং তার আশা করাও অবাস্তব। শরণার্থীদের সংখ্যাক্ষীত দাবী সমাধানের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক হতে পারে না। যুক্তি ও দলিল প্রমানের সাথে বিষয়টি আবদ্ধ। বারবার যাচাই বাছাই করে প্রমাণিত বাংলাদেশীদের গ্রহণ করা যাবে। কোন অবাংলাদেশীকে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্থানীয় ভোটার তালিকা, আদমশুমারী, জায়গা জমির দলিল পত্র, মামলা মোকদ্দমা কর খাজনা রশিদপত্র অনুরূপভাবে স্থানীয় জবিন যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত প্রমানাদিকে কোন মতেই অস্বীকার করা যাবে না। তবে শুধু মৌখিক দাবী অথবা শরণার্থী কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রমানপত্র হিসাবে মানা যাবে না। পূর্বাহ্নেই খুটি নাটি আপত্তি উথাপন করা ঠিক নয়; এবং প্রাথমিকভাবে বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর দাবীতেও ঘাবড়ে যাওয়া অনুচিত। অনুকূল আগ্রহই এখানে প্রধান বিবেচ্য বলা যায়। শান্তির ক্ষুদ্রতম সুযোগকেও আমাদের জাপটে ধরা আবশ্যক।

স্থানীয় তিন সংসদীয় আসন, সরকার ও সংসদ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। শান্তির স্বার্থে এখানে নির্বাচনী নীতি বিবেচিত হতে পারে।

(ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

অশান্তি অসন্তোষ কী ও কেন?

সারা দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী। তার মানুষগুলি রং গঠন, ভাষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিচারে কতিপয় স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। জাতীয় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও এখানকার মানুষ ভিন্ন বৈশিষ্টের অনুসারী। গোটা দেশের ৯৯% মানুষ বাঙ্গালী হওয়ায়, তাদের মাঝে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও সামাজিক অনুভূতিতে বিপরীতমুখী পার্থক্য খুব বেশী প্রকট নয়। অমিলের চেয়ে মিলের ব্যাপারগুলি তাদের পরস্পরকে অধিক আপন ভাবার অনুভূতি যোগায়। কিন্তু এখানকার পার্বত্য অবাঙ্গালী সমাজ জাতীয়ভাবে সংখ্যালঘু এবং আঞ্চলিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায়, নিজেদের স্বাতন্ত্র আধিপত্য আর অস্তিত্বের নিরাপত্তার প্রশ্নে সন্দিগ্ধ ও ভাবিত। তাদের এই সন্দেহপ্রবণ মানসিকতাকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজনেই, নিরাপদ ভবিষ্যৎ কামনায়, তাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা, কিছু ভিন্নভাবে পরিচালিত। এই চিন্তার সাথে, জাতীয় চেতনার অমিল ও সংঘাত ঘটায়, বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন শান্তিবাহিনীর জন্ম সূত্র ইহাই। বৃটিশ আমল থেকেই এখানে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের একটি ধারা প্রবহমান। তখন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ আর আধিপত্য সুসংহত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একদল শিক্ষিত অভিজাত, পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার সাথে স্থানীয় আধিপত্য ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রশ্ন জড়িত ছিলো। পাকিস্তান আমলের শেষ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বপ্রথম মৌখিকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে, সাধারণ লোকজনকে উজ্জীবিত করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরোধীতায় তিনি সোচ্চার হোন। পরে তিনি লিখিতভাবে চার দফা সম্বলিত দাবী তখনকার সরকার প্রধান শেখ সাহেবের নিকট পেশ করেন ও উহা গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে অগ্রসর হোন। পরবর্তী জিয়া সরকার স্থানীয় সশস্ত্র বিদ্রোহকে দেশ রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে তার স্থায়ী সমাধান হিসাবে বিদ্রোহী পক্ষকে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টায় তড়িঘড়িতে বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধি, সেনা ছাউনী নির্মাণ ও স্থানীয় উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হলে তিনি পুনরায়

www.pathagar.com

আপোষের পথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্যোগ নেন। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মারিষ্যার গহীন বনাঞ্চলে রাত্রি যাপনের মাধ্যমে তিনি ঐ পক্ষকে আপোষ মীমাংসার আহবান জানান। সেই আশাব্যঞ্জক ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার সূচনাতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শাহাদৎ বরণ করেন এবং মীমাংসার উদ্যোগটি তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী এরশাদ সরকার সমস্যাটির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টায় ব্রতী হোন এবং আলাপ আলোচনাকে অরাজনৈতিক অঙ্গনে ঠেলে দিয়ে মীমাংসাকে অসম্ভব করে তুলেন। ঐ আলোচনা বৈঠকে সহনশীল রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা গুরুত্ব পায় নি। দুপক্ষই মীমাংসার অনুপযোগী দাবী দাওয়ায় অটল ছিলেন। অথচ উথাপিত দাবী দাওয়ার ভিতরই এরশাদ সরকারের পতনের পরে বর্তমানে বিদ্রোহী মহলে নমনীয়তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তারা প্রথমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন দানের জন্য তাদের সমাজের লোকজনকে আহবান জানান। পরে শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে তাদের চলমান সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে দাবী উথাপন করেন। দাবীটির মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রোহী মহলের নিজেদের ঐ ইচ্ছাটিরও প্রকাশ ঘটেছে যে, আসলে তারা ও সসম্মানে স্বদেশে ফিরে আসতে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবী দাওয়ার মীমাংসায় আগ্রহী। তাদের উথাপিত শরণার্থী সংখ্যার অতিরঞ্জিত দাবীটি এবং বিচ্ছিন্নভাবে এখনো পরিচালিত তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনাগুলি সন্দেহ অবিশ্বাসকে এখনো ধরে রেখেছে। মনে হচ্ছে বিদ্রোহী পক্ষ শান্তির পথ গ্রহণে এখনো আন্তরিক নন। তাদের মনে এখনো দুরভিসন্ধি কার্যকরী আছে। এই সন্দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছে আমাদের অনুরোধঃ নমনীয় পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা থেকে বিরত থাকুন। নিঃসন্দেহে অনেক শরণার্থী এযাবৎ ফিরৎ এসেছেন। দেশের মাটিতে তাদের সংখ্যা গণনা করা যাবে, সুতরাং উহা প্রমান সাপেক্ষ। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। প্রমান সাপেক্ষ সমুদয় শরণার্থীকে স্বদেশের মাটিতে গ্রহণ করতে কেনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। তবে পাকিস্তান আমলের শরণার্থীদের বাংলাদেশী করার প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য। সে আমলের স্থানান্তর ও অধিবাস গ্রহণের ঘটনাগুলি, দেশ বিভাগ ও বিজাতীয় রাজনৈতিক আনুগত্যের সাথে জড়িত। এ যুগে তার পরিবর্তন হতে পারেনা। যদি হিংসা আর রক্তপাতের প্রতি অনীহ এবং শান্তিপূর্ণ বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের প্রতি আগ্রহান্বিতই হবেন, তবে কেন সন্ত্রাসী উৎপাত অব্যাহত রাখা? বিদ্রোহী মহলের আন্তরিকতার প্রতি আমাদের এই সন্দেহ কী অমূলক? প্রমাণের দায়িত্ব তাদেরই।

এখন দেখা দরকার অতীতে মীমাংসার আলোচনায় কী কী সমস্যা চিহ্নিত এবং কোন্ কোন্ প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সম্ভাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রগুলি তা থেকে ভিন্ন হবেনা।

www.pathagar.com

আমাদের বিচারে দুটি প্রশ্নে মাত্র অনমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্রোহী পক্ষের দাবী ছিলোঃ পূনর্বাসিতসহ ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সমুদয় অতিরিক্ত বাঙ্গালী জন সমষ্টিকে প্রত্যাহার এবং দ্বিতীয় দাবী ছিলোঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান। এই উভয় প্রশ্নে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি ভিত্তিক দীর্ঘ কোন আলোচনা পরিচালিত হয় নি। উভয় পক্ষের আলোচকবৃন্দের ভিতর রাষ্ট্র বিজ্ঞানী আইনজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিক সদস্য ছিলেন না। তাড়াহুড়ার ভিতর সপক্ষীয় সুবিধা আদায় এবং বিপক্ষকে বাধ্য করার এক তরফা মনোবৃত্তি কার্যকরী ছিলো। সুতরাং কেন বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যাবে, বা থাকবে এবং কেন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান জরুরী বা অসম্ভব তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আলোচনা হয় নি। উভয়পক্ষের দাবী সঙ্গত কি অসঙ্গত উহাও নির্ধারণের প্রয়োজন ছিলো। খুটি নাটি মূল্যায়ণ ছাড়াই, সরকার পক্ষ উত্তর দেনঃ বাঙ্গালী প্রত্যাহার অসম্ভব এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান, সংবিধান সম্মত নয়। এর প্রত্যুত্তরে বিদ্রোহী পক্ষ নিজেদের দাবীতে অটল থাকেন। সুতরাং ৬ষ্ঠ বৈঠকের সময় আলোচনা ভেঙ্গে যায়। বিদ্রোহী পক্ষের ৫ দফা দাবীর বিপরীতে সরকার পক্ষ ৯ দফা সম্বলিত সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব দেন। কিন্তু মত পার্থক্য অক্ষুন্ন থাকে। ঐ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অতঃপর বিদ্রেহী সমাজের কিছু নেতৃবৃন্দকে সম্মত করে তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নেন, যার বিরোধীতায় বিদ্রোহী পক্ষ এবং তাদের সমর্থক লোকজন এখনো সোচ্চার। মনে হয় মীমাংসার আলোচনায় বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানীয় স্বশাসনের প্রশ্নে কিছু ছাড় দেওয়া বা নমনীয় হওয়া ব্যতীত বিদ্রোহী পক্ষ অস্ত্র ত্যাগে সম্মত হবেন না। এই দুই প্রধান প্রশ্নেই এখন বিরোধীতা সীমাবদ্ধ বলা যায়।

(মার্চ ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

চাওয়া পাওয়ার আরো আছে

স্থানীয় অশান্তি অসন্তোষ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণাকে এক সাথে বিবেচনা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবী দাওয়া আর সামাজিক চাহিদাকে বিবেচনা করা হলে সামগ্রিক মীমাংসার চিন্তা সুসংহত হওয়া কঠিন। ইতিমধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের পক্ষে প্রচুর বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবু সামগ্রিক সুফল অর্জিত হয় নি । অনেকক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়েছে, যেমন অবাঙ্গালীদের লেখাপড়া ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোটা ব্যবস্থার গুণে চাকমা সমাজ বিস্ময়করভাবে অধিক উপকৃত, কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু পূর্বের মত সমান পশ্চাদপদই আছে। উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা সমানভাবে সব সংখ্যালঘুদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জিত হয় নি । তাই অশান্তি অসন্তোষের স্থান ও পাত্রের বদল হতে পারে। সুতরাং বিশেষ নয়, সামগ্রিক ও প্রত্যেকের সুবিধা সুযোগের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হতে হবে।

সংকট সৃষ্টির জন্য কি কি সমস্যা দায়ী এবং তার সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে তার সামগ্রিক রূপরেখা ও পরিকল্পনা থাকা দরকার। ইতিমধ্যে সংকট ও সমস্যার অনেক সংকোচন ঘটেছে। অনেক ব্যাপারে আশাতীত অগ্রগতি হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয় ছাড়া বিরোধীয় প্রশ্নগুলির প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। অবশিষ্টের তালিকায় পড়ে থাকা বিষয়গুলির প্রতি এখন মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

এখানে শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতি সারা বাংলাদেশে সর্বাধিক। তবু সর্বাধিক সংখ্যক অক্ষর জ্ঞানহীন লোক, কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের মাঝে থাকা বিরাট ব্যর্থতার শামিল। এই ব্যর্থতার প্রতিবিধান হওয়া দরকার। সাথে সাথে এখানকার শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য আর তজ্জন্য গৃহীত সরকারী অবদানগুলির চিত্র সর্বক্ষেত্রে উদ্ভাসন আবশ্যক। উপকৃতদের কৃতজ্ঞ করা এবং সমালোচকদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে ঘোষিত হওয়া উচিত যে, এখানকার সংখ্যালঘুদের শিক্ষার হার

www.pathagar.com

সারা বাংলাদেশের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। এখানে এমন শিক্ষার্থী পাওয়া মুশকিল যে, সরকার থেকে আর্থিক অনুদান বা বৃত্তি লাভ করে না। সরকারী ব্যয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রদের হোষ্টেল পরিচালিত হয়। তাদের উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরী সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় কম যোগ্যতা মান্য ও কোটা সংরক্ষিত। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অনুরূপ আরো রেয়াতী যোগ্যতা, বর্ধিত পদ বিশেষ সুযোগ ও অগ্রাধিকার প্রদত্ত হয়। দরিদ্র দেশের অন্যান্যের পক্ষে ইহা অবিচার হলেও তজ্জন্য কেউ ক্ষুব্ধ নয়।

রোজি রোজগার ও খাদ্য সংস্থানের সুযোগ প্রাকৃতিকভাবে ও এখানে বেশী। একজন সাধারণ লোক, শুধু দা ও কুড়ালকে অরলম্বন করে তার নিকটবর্তী পাহাড় ও বন থেকে অনায়াসে কয়েক ঘন্টায়ও কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই বাঁশ, গাছ, লতা, পাতা, লাকড়ি, খুঁটি বেত ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে বিক্রয়ের মাধ্যমে টাকা কামাতে পারে। বিস্তৃত কর্ণফুলী হ্রদে মাছ শিকার যাত্রী পারাপার নৌকা সাম্পান চালনা ইত্যাদির দ্বারা সহজেই জীবিকার চাহিদা মিটান যায়। বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলি স্থানীয় সংখ্যালঘুদের জন্য অবাধ। মিতব্যয় আর অধ্যবসায়ের দ্বারা তাদের পক্ষে পুঁজি গঠন অধিক সহজ। সাংগঠনিকভাবে পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে সফল সহায়তার উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে ভোগবাদী সহায়তাদান অনুচিত। তা লোকজনকে কর্ম বিমুখ বেকার ও পরনির্ভরশীল করে তুলে। শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগানোর প্রবণতা ক্ষুন্নকারী আর্থিক অনুদান ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বচ্ছল হয়ে গড়ে উঠার পথে বাধা হয়ে উঠেছে। বন্দুক আর আন্দোলন, ভোগবাদী রোজগারের সফল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদের উঠতি প্রজন্ম, চরিত্রের গঠন মুখীতা প্রায়ই হারিয়ে ফেলেছে। উগ্র মারমুখীতা ক্ষতিকর। যে বিভিন্ন মুখী সাংগঠনিক চরিত্র সমাজের খুটিনাটি চাহিদা মিটাবার পক্ষে জরুরী, সংখ্যালঘু সমাজে তার অভাব প্রকট। এককালে তারা লাঙ্গল ভিত্তিক চাষ কাজটি ও জানতো না। মাত্র গত শতাব্দীতে সরকারীভাবে বাঙ্গালীদের সহায়তায় জমি আবাদ ও চাষ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের জানার মধ্যে ছিলো জুম চাষ বনজদ্রব্য আহরণ, বেত বাঁশের ঝুড়ি তৈরী ও গৃহ নির্মাণ এবং তাঁতের সাহায্যে কিছু মোটা কাপড় বোনা ও চরকায় সূতা কাটা। এখনো তাদের পেশা ও শ্রম বহুমুখী নয়। উচ্চ শিক্ষা এযুগেরই অবদান বলে তাদের অনেকেই এখন উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ বৃত্তিতে নিয়োজিত। কিন্তু সাধারণ লোকের পেশা ও শ্রম এখনো আগের মত সীমিতই আছে। বহুমুখী নিম্নবৃত্তিগুলি যেনো তাদের অজ্ঞাত। কামার, কুমার, জেলে, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর, মাঝিমাল্লা, মিস্ত্রি, আরাকশী সুতার,

www.pathagar.com

সোনার, দর্জী, দোকানদার ইত্যাদি বহুতর নিম্ন বিত্তের পেশাদার লোক সংখ্যালঘু অবাঙ্গালী সমাজে বিরল। আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনে এসব লোকের প্রয়োজন অত্যধিক। দেশের প্রয়োজনীয় আসবাব ও নিত্য ব্যবহার্য শিল্প সামগ্রীর প্রয়োজন মিটাতে এদের ভূমিকা অত্যন্ত বেশী। চিরকাল বাঙ্গালী নিম্নবিত্তের পেশাজীবিরাই পর্বতাঞ্চলের এতদসংক্রান্ত শূণ্যতা পূরণ করে এসেছে। এ কারণে অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু সমাজ চিরকাল ধরে বাঙ্গালী নির্ভর। ইহা এতদাঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই অভাবটির পূরণ ছাড়া শুধু শাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চিন্তার মাঝেই, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন, যে আন্দোলনের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজ। যদি একদা স্থানীয় অবাঙ্গালী সমাজ স্বশাসন ক্ষমতা লাভও করেন, তখন নিজেদের অসহায়ভাবে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীনির্ভর দেখতে পাবেন। তাই তাদের প্রয়োজন শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ নয়, জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য দরকার হিংসা ও বিভেদের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের সার্বিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি লাভ। এই সাথে ইহাও ভাবতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশ নির্ভর। ক্রমিক নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশই ইহার স্বাভাবিক যোগাযোগের অঙ্গভূমি। এর সংযোগ পর্বতাঞ্চলের জন্য অপরিহার্য।

ভেবে দেখা দরকারঃ সম্পদের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া সত্ত্বেও অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুরা আজ দরিদ্র। এজন্য কেউ নয়, নিজেদের গুণগত পশ্চাদপদতাই দায়ী। প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালীদের নির্মূল বা বিতাড়ণ করা তার প্রতিকার নয়। বরং তদ্বারা শূণ্যতাই সৃষ্টি হবে। জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। সুই, সূতা, হাড়ি, পাতিল, জুতা, সেন্ডেল থেকে শুরু করে উঁচু প্রযুক্তির ক্ষেত্র পর্যন্ত দক্ষতা সম্প্রসারিত না হলে পরকে কখনো অবহেলা করা উচিৎ নয়। অবাঙ্গালী সমাজ পেশাগতভাবে এখনো সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছেন। যে প্রাকৃতিক সম্পদে এতদাঞ্চল সমৃদ্ধ, সেই কাঠ, বাঁশ, লতা, বেত ইত্যাদি প্রাথমিক পণ্যের দ্বারা বহুতর শিল্পপণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। ক্ষুদ্র বৃহৎ ও কুটির শিল্পের ঐসব পণ্যাদি উৎপাদন মহার্ঘ্য পেশা। বিপুল সংখ্যক লোকের তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব। অনেক কুটির শিল্পের কারিগরি দক্ষতা, পারিবারিক ও সমাজগতভাবে অর্জন করা যায়। উঁচু প্রযুক্তি ছাড়াও গ্রাম্য কারিগরী জ্ঞানে অনেক কিছু করা সম্ভব। যন্ত্রপাতি ও কারখানা নির্ভর শিল্পকর্মে মোটা পুঁজি নিয়োগের প্রশ্ন জড়িত থাকলেও অল্প পুঁজি ও কারিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল সহজ পেশা ও শিল্পকর্মের সংখ্যা ভুরি ভুরি। আসবাব ও গৃহস্থালী জিনিষপত্রের অনেক কিছুই সামান্য হস্ত শিল্পের কাজ। সাধারণ দা, ছুরি, বাটাল, হাতুড়ি, আরা, মাটাম

www.pathagar.com

ইত্যাদির চেয়ে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির তাতে প্রয়োজন হয় না। কাঁচা মাল হিসাবেও প্রয়োজনীয় পণ্যাদি এখানে সহজপ্রাপ্য ও সস্তা। উদ্যোগ আয়োজন ও শ্রমের দ্বারা এখানে প্রতিটি ঘরকে একেকটি কারখানায় পরিণত করা যায়। বাঁশ, বেত ও কাঠের আসবাব পত্রের বিপুল চাহিদা বিদ্যমান। ইহা সাধারণ লোকের আয় রোজগারের এক সমৃদ্ধ উপায় হতে পারে। দ্বিতীয় যে উপায়টি সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক, সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে, শুধু আহরণ ও স্থানীয়ভাবে বিক্রির পরিবর্তে তদ্বারা শিল্পপণ্য সৃষ্টি ও বাণিজ্য করার প্রতি মনোযোগ দান উপকারী হতো। অথচ এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলি পুঁজি গঠন রোজগার বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে, জুমের আগুণে চিরকাল ধ্বংস করা হয়েছে। বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষার প্রতি স্থানীয় অবাঙ্গালী সমাজ চিরকাল অমনোযোগী। ইহা তাদের নিজেদেরও প্রকৃতির প্রতি অপূরনীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ অবাঙ্গালীদের আয় রোজগারকে বহুমুখী করার স্বার্থে তাদেরকে কারিগরী ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে। নতুবা তাদের বর্তমান উচ্চবৃত্তির আন্দোলনে অর্জিত অগ্রগতি পরনির্ভরশীলতায় পর্যবশিত হবে।

(এপ্রিল ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯০০ খ্রীঃ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র কিছু আইন কানুনের দ্বারা শাসিত। তাতে এতদাঞ্চল ও তার উপজাতীয় অধিবাসীদের একটি পৃথক প্রশাসনিক মর্যাদা ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। প্রায় শতাব্দী কালের দীর্ঘ এই মর্যাদা আর ঐতিহ্যেরই সৃষ্টি উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য, আর উপজাতীয় প্রশাসন। যদিও উপজাতীয় প্রশাসন সরকারী তাবেদারী মাত্র, আদি ও অপরিহার্য্য কিছু নয়। তবু দীর্ঘ দিনের সরকারী অনুমোদন ও ক্ষমতা ভোগের কারণে, উহা স্বার্থ-আভিজাত্য-পুষ্ট একটি শক্তি। তহসিলদারী, সরকারী সম্পদ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসনিক সহায়তা দান, উপজাতীয় সামাজিক শৃংখলাবিধান ইত্যাদি স্বপারিশ্রমিক দায়িত্ব, উপজাতীয় প্রশাসনের উপর ন্যস্ত। সুতরাং উহা স্থানীয়ভাবে একটি ছায়া সরকারী ব্যবস্থ্যাও বটে, যার ভিত্তি সরকারী নিযুক্তি। তিন উপজাতীয় সর্দার বা রাজা, তিনশত তেহাত্তর জন হেডম্যান বা মৌজা প্রধান এবং শতাধিক বাজার চৌধুরীদের নিয়েই এই ছায়া প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১/১৯০০ এর আওতায় এই উপজাতীয় প্রশাসনের আইনানুগ অস্তিত্ব বিদ্যমান। মূলতঃ উপজাতীয় প্রশাসনই তাদের আধিপত্যবাদী চেতনার মূলস্তম্ভ। আইনতঃ উহা সরকারী তাবেদারী, আর বাস্তবেও তা বাঙ্গালী প্রাধান্যে পরিচালিত। তবু তৎপ্রতি মান্যতা কমই প্রদর্শিত হয়। মনে করা হয়, এতদাঞ্চলে উপজাতীয়দের একাধিপত্য স্থায়ী আর অলংঘনীয়। তবে দেশ ভিত্তিক অভিন্ন আইনেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এতদাঞ্চল শাসিত হলে এই অত্যুঙ্গ একরোখা মনোভাব গড়ে উঠার সুযোগ হতো না। ঔপনিবেশিক স্বার্থ আর বিশেষ পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী।

ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা যে, ১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান রাজ্য আক্রান্ত ও বিজিত হয়। আক্রমণকারী বর্মীদের অত্যাচারে আরাকানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী স্বদেশ ত্যাগ করে বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের মাঝে মগ ও চাকমা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিলো সর্বাধিক। এই উদ্বাস্তু সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল রূপ ধারণ করে। স্বদেশভূমি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কিছু সংগঠিত জঙ্গী উদ্বাস্তু আরাকানে প্রায়ই ঝটিকা আক্রমণ চালাতো এবং সেখানকার প্রশাসনকে বিব্রত করে তুলতো। তাতে বর্মী কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মে যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষই ঐ

www.pathagar.com

বিদ্রোহীদের মদদ দাতা। বিষয়টি কূটনৈতিক বিরোধের সীমা ছাড়িয়ে সীমান্ত সংঘর্ষ পর্যন্ত গড়ায়। বিরোধ ও সংঘর্ষ এড়াবার অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত বাড়তেই থাকে। সীমান্তের দুর্গম অনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটিকে উদ্বাস্তুমুক্ত করাও সম্ভব ছিলো না। বার্মাকে দমাবার হাতিয়ার হিসাবে ও উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের সুযোগ ছিলো। তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ধরে রাখার প্রতিও প্রলুব্ধ ছিলেন। অবস্থানের দীর্ঘস্থায়িত্ব আর কর্তৃপক্ষের নমনীয়তার সুযোগে অনেক উদ্বাস্তু সুবিধামত জায়গায় বাড়ী ঘর গড়ে তুলে এবং অনেকে কৃষি কাজ শুরু করে দেয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনেক উৎসাহী উদ্বাস্তুকে সীমান্ত অঞ্চল ও পটুয়াখালীতে পূনর্বাসন দান করেন। তবু বার্মার সাথে সীমান্ত বিরোধ আর জঙ্গী উদ্বাস্তুদের আরাকান আক্রমণ লেগেই থাকে। আরাকান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা ও ব্যাহত হয় না। ফলে দু'সরকারই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। উভয় দেশই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। বৃটিশরা আরাকান দখল করে তাকে ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিনত করে। বার্মার বৈরীতাকে মোকাবেলার উদ্দেশ্যেই লুসাই, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও লক্ষিমপুর পর্যন্ত পূর্ব আসামে, বৃটিশ দখল সম্প্রসারিত আর পরিপূর্ণ করা হয়। এভাবে বঙ্গোপসাগর উপকূল থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত বার্মার পশ্চিম সীমান্তের সারাটা জুড়ে, বৃটিশদের সাময়িক উপস্থিতি সম্পন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে আভ্যন্তরিণ বিদ্রোহ আর অরাজকতা দমনের ব্যবস্থা ও গৃহীত হয়। সীমান্তের অবাধ্য জনগোষ্ঠী আর মুক্তাঞ্চলবাসী উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত, আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাদিও গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে মূল চট্টগ্রাম থেকে পৃথককরণ, কুকি দমন অভিযান, অনুগত বহিরাগত উপজাতিদের পূনর্বাসন দান এবং বিশেষ প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি তখনকার সে বিশেষ পরিস্থিতিরই প্রতিফলন। ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক আরাকানী উদ্বাস্তু সরকারী বাধা নিষেধের অবর্তমানে সর্বত্র বসতি গড়ে তুলছিলো। পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলের জন বিরলতাকে কাটিয়ে তোলার ঐ বেসরকারী প্রক্রিয়াকে সরকার পরিস্থিতিগত কারণে স্বাগতই জানিয়ে ছিলেন। বেআইনী হলেও ঐ আবাদকরণ ও বসতি স্থাপন বাধাগ্রস্ত হয় নি । বার্মার সাথে শান্তি স্থাপন পর্যন্ত ঐ প্রক্রিয়া অব্যাহতই থাকে। তবে দীর্ঘ বসবাস ও জন্ম মৃত্যুর কারণে অভিবাসীদের এ মাটির সাথে দৃঢ় স্বার্থ সম্পর্ক গড়ে উঠে। যদিও আইনতঃ তাদের অভিবাসন ও নাগরিকত্বের ব্যাপারটি অমীমাংসিতই ছিলো। উহাতেই ১৯০০ সালে প্রনীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৫২ ধারা ও অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। তখনো আরাকান, আসামের লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরা রাজ্য ছিলো অবিভক্ত ভারতের অংশ; এবং বাংলাসহ ঐসব অঞ্চলের ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব অধিবাসীর জাতীয়তা ভারতীয়। বর্ণিত

www.pathagar.com

পরিবেশ পরিস্থিতি ও বর্তমানের আলোকে এখন ঐ বিশেষ আইনগুলি বিবেচ্য, যা প্রকৃতই বৈষম্যপূর্ণ, ন্যায়নীতি বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক, যথাঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি-১/১৯০০

ধারা ৫২। Immigration into the Hill Tracts:

A) Save as hereinafter provided, no person ather than a chakma, mogh or a member of any Hill Tribe, indigenous to the Chittagong Hill Tracts, the Lushai Hills, the Arakan Hill Tracts, or the State of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts, unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

বাংলাঃ পার্বত্য অঞ্চলে অভিবাসন।

(ক) নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি থাকা ব্যতিরেকে যারা চাঁকমা মগ অথবা কোন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড়, পার্বত্য আরাকান অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী পরিচিত, তারা ব্যতীত অপর কেহই পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবেনা, যদি না ঐ ব্যক্তির অধিকারে জিলা প্রশাসক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতিপত্র থাকে।

তাৎপর্যঃ

১। চাকমা, মগ, লুসাই, আরাকানী ও ত্রিপুরা বাদে অপরদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস নিষিদ্ধ হয়।

২। স্বদেশী বিদেশী তফাৎ ছাড়াই বর্ণিত সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া অন্যদের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ অনুমতি সাপেক্ষ হয়।

৩। এতাদাঞ্চল বাংলা প্রদেশভুক্ত এলাকা বলে, বহিরাঞ্চলবাসী চাক্মা, মগ, লুসাই, আরাকানী ও ত্রিপুরাবাসীদের তুলনায়, এখানে ন্যায়তঃ বাংলাবাসীদের বসবাসের অধিকার অগ্রগণ্য হওয়া উপেক্ষিত হয়।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, অন্যান্য আরাকানী, লুসাই ও ত্রিপুরাগণ বহিরাগত অভিবাসী হিসাবে গণ্য হয়।

৫। এই আইনে চাকমা ও মগদের বিশেষণে উপজাতি পাহাড়ী ও আদিবাসী সংজ্ঞাগুলির ব্যবহার হয় নি। আইনে শুধু সাম্প্রদায়িক নামেই তারা

www.pathagar.com

আখ্যায়িত। সুতরাং তাদের পরিচয়ে উপজাতি ও পাহাড়ী বিশেষণের সংযোজনপ্রযোজ্যনয়।

৬। আইনে পৃথকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী উপজাতি পরিচিত এক দল লোকের স্বীকৃতি থাকলেও তা সুনির্দিষ্ট হয় নি। সম্ভবতঃ তারা ঐসব লোক যারা বিদেশাগত বসতি স্থাপনকারীদের প্রতিরোধে লিপ্ত ছিলো। অতীত কথা-কাহিনীতে তারা মুন্ড শিকারী কুকি নামে বিবৃত। অধুনা লুসাই পাংকো ও বনযুগী নামে তাদের উত্তর পুরুষরা পরিচিত। উহারাই প্রকৃত স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী উপজাতি। তারাই প্রকৃত পক্ষে এ মাটির সন্তান। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনতঃ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকারী তারাই।

৭। বাঙ্গালীরা অভিবাসী নয়, মূল স্থায়ী বাসিন্দা অথবা প্রতিবেশী। তাদের উপর অভিবাসন আইন প্রযোজ্য নয়।

৮। আইনে অভিবাসীগণ দু'ভাগে বিভক্ত যথাঃ অবাধ অভিবাসী ও অনুমতি সাপেক্ষ অভিবাসী। প্রথমোক্তরা চাকমা, মগ এবং বিভিন্ন উপজাতীয় লোক যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড় আরাকানের পর্বতাঞ্চল ও ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী পাহাড়ী। দ্বিতীয় দল ভুক্ত হলেন আসামী নেপালী ভুটানী ও অপরাপর ভারতবাসী সহ অন্যান্য বিদেশী অধিবাসী।

৯। আইনটি অভিবাসন নামীয় হলেও কার্যতঃ তদ্বারা স্বদেশবাসী ও স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের বসবাস ও সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইহা স্বদেশী নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশী আমন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। ইহারই পরিনতি হলোঃ স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের তুলনায় বহিরাগত চাক্মা, মগ, ত্রিপুরা ও অন্যান্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

১০। পক্ষপাতিত্বমূলক অভিবাসনের সুযোগ দান সত্বেও বহিরাগত অধিকাংশ মগ চামকা, ত্রিপুরা ও অন্যান্যরা এতদাঞ্চলের প্রামান্য অভিবাসীতে পরিণত হয় নি । যাযাবর জুমিয়া হওয়ায় তাদের ভূম্যাধিকার ঘটে নি। পাকিস্তান আমলের শেষ থেকে বাংলাদেশ আমলেই মাত্র তারা ভূমি বন্দোবস্তির সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং তারা এ যাবৎ কালের ভ্রাম্যমান অধিবাসী মাত্র, পরিপূর্ণ নাগরিক বা আইনানুগ অভিবাসী নয়।

১১। কোন আইন বলে মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রদ করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই মূল্যায়ণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন আইনের রিধি নিষেধ ও তার সৃষ্ট পরিনতিকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। হতে পারে আইনটি

www.pathagar.com

এখন রহিত, কিন্তু তার সৃষ্ট পরিণতি বজায় থাকায় বেআইনী অভিবাসনের সুযোগ গ্রহণকারী ও তাদের বংশধরগণের উপর এখনো উহার সুফল ও কুফলের উত্তরাধিকার বর্তায়।

১২। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আইনী ও বেআইনী অভিবাসী মাত্র তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতার দাবী মৌলিক নয়। এখনো তাদের নাগরিকত্ব চ্যালেঞ্জমুক্ত নয়। সুতরাং এই প্রশ্নে হিংস্র আর অহিংস্র আন্দোলন সমানভাবেই বিপজ্জনক। অসন্তুষ্ট মূল নাগরিকদের দ্বারা তাদের বসবাসের অধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়া সম্ভব।

উপজাতীয় প্রশাসন বা স্থানীয় প্রশাসনে এখানকার আদিবাসিন্দাদের আধিপত্য থাকাই উচিত ছিলো, তাতে অভিবাসীরা স্থানীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু কার্যতঃ হয়েছে বিপরীত। অভিবাসী নেতৃবৃন্দ স্থানীয় প্রশাসনিক সহযোগিতে পরিণত হোন। আদিবাসিন্দারা অভিবাসী শাসিত প্রজা হয়ে দাঁড়ান। এভাবে সংখ্যাধিক্য আর প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে অভিবাসীদের আভিজাত্য আর দাপট প্রকট হয়ে উঠে। তারা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত সুবিধা সুযোগ লাভের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে পরিপুষ্ট হোন। কিন্তু তাদের এই উচ্চাভিলাষ পূরণের পথে প্রধান বাধা হয় রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী বাঙ্গালী জনগোষ্টী। স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালীদের সংখ্যা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে অভিবাসীদের আধিপত্য বজায় থাকা সম্ভব নয় এবং উহা নিয়মতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলনের দ্বারা ঠেকান ও যাবেনা, এই ধারণা থেকেই বাহিরদেশীয় সহযোগিতায় সশস্ত্র আন্দোলনের জন্মলাভ ঘটে, এবং উহারই অংশ হলোঃ বিভিন্ন অপবাদ রটনা ও লাঞ্ছনা বঞ্চনার কাহিনী প্রচার।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির অন্যতম শিক্ষা হলোঃ সাম্প্রদায়িক সংখ্যাধিক্যের বলে পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা সম্ভব। বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান উহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিপক্ষ অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চল হলো অনুরূপ আন্দোলনের উর্বর ক্ষেত্র। মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীর আর শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাবের স্বাধিকার আন্দোলন এ কারণেই অত্যুঙ্গমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহের প্রকৃতিও তাই। দাবীটির লক্ষ্য হলো প্রথমতঃ অবাঙ্গালী সংখ্যাধিক্য বজায়রাখা, তৎপর স্থানীয় প্রশাসনকে হস্তগত করা এবং চূড়ান্তে সুযোগ মত স্বশাসন প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার লক্ষ্য ব্যক্ত না হলেও উহা একটি গোপন বাস্তবতা। সেই সুদুর প্রসারিত বিচ্ছিন্নতাকে ঠেকাবার একমাত্র উপায় হিসাবে বাঙ্গালী পুনর্বাসনের প্রয়াসকে রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তই বলা যায়। ইহা বিদ্রোহ প্রতিরোধক। এরশাদ সরকার কর্তৃক বিদ্রোহীদের অস্ত্র ত্যাগের সম্মতি ছাড়াই ইহার ব্যতিক্রম করে সেনা

www.pathagar.com

অভিযান ও বাঙ্গালী পুনর্বাসন স্থগিত করণ সহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নামীয় একটি অভিনব স্বশাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। পরিস্থিতি শান্ত করণে যার অবদান সন্দেহজনক। এই ব্যবস্থাটি অগণতান্ত্রিক বৈষম্য মূলক এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। এখানে ব্যবস্থাটির পরিবেশ পরিস্তিতি আলোচিত হওয়া দরকার।

সরকার সেনা নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের সাথে মীমাংসা আলোচনায় বসেন। আলোচ্য সূচী হলোঃ বিদ্রোহীদের ৫ দফা ও সরকার পক্ষের ৯ দফা। ছয়টি ব্যর্থ বৈঠকের পর আলোচনা ভেঙ্গে যায়। প্রতিপক্ষীয় দাবী গুলি পরস্পরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। সরকার বিদ্রোহী বহির্ভূত কিছু উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতায় উপনীত হোন। প্রণীত হয় স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা। উহা আইন আকারে সংসদে গৃহীত হয় এবং অনতিবিলম্বে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত পরিষদ তিনটি ক্ষমতাসিন হয়। এখন দেখা দরকার বিদ্রোহীরা কি চেয়েছিলো আর বিপরীতে সরকার কি দিয়েছেন এবং শান্তি স্থাপনে অগ্রগতির পরিমান কতটুকু।

বিদ্রোহীদের দাবীকৃত ৫ দফার প্রথম ও প্রধানটি হলো; কতিপয় বিশেষ ক্ষমতাসহ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ, যা সরকার কর্তৃক সংবিধান বিরোধীতার অজুহাতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে ঐ দাবীটি দ্রষ্টব্যঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

খ) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদানকরা।

গ) প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গতি হইবে। এবং প্রদেশ তালিকাভুক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে।

ঘ) দেশরক্ষা বৈদেশিক (সম্পর্ক) মুদ্রা ও ভারি শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনজ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস্য, অর্থ, পশু পালন, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বেতার ও টেলিভিশন, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহণ, ডাক, কর ও খাজনা, জমি ক্রয় বিক্রয় ও বন্তোবস্তি, আইন শৃঙ্খলা বিচার, খনিজ তৈল ও গ্যাস, সংস্কৃতি, পর্যটন, স্থানীয়স্বায়ত্ত শাসন, সমবায়, সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রেস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সীমান্ত রক্ষা, সামাজিক প্রথাও অভ্যাস উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা।

www.pathagar.com

ঙ) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ যাহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে তজ্জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করা।

চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম ল্যান্ড (Jumma Land) নামে পরিচিত করা।

ছ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন (Amendment) করা।

সূত্রঃ দাবীনামা ১৭ই ডিসেম্বর/৮৭

এখানে বিবেচ্য যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বাংলাদেশের সংবিধান সম্মত না হলেও রাজনৈতিক বিচারে উহা অন্যায় কিছু নয়। সংবিধান সংশোধন করাও প্রয়োজনে সম্ভব। এই প্রশ্নে খুঁটিনাটি আলোচনা হওয়া, রাজনৈতিক বিষয় চর্চারই শামিল। রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুস্থিতির স্বার্থে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা ও জাতীয়ভাবে অনুমোদন সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ কিছু নয়। আলোচনায় পক্ষীয় বিপক্ষীয় যুক্তি ও বৈষয়িক জটিলতা প্রদর্শণের মাধ্যমে অনেক ছাড় ও নমনীয়তার উপস্থিতি সম্ভব ছিলো। সেনা নেতৃত্বে এরূপ জটিল রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের আশা করা ও ভুল। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবীর পক্ষে আলোচনায় ব্রতী হলে সারা দেশ ব্যাপী এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে। এই সম্ভাবনাও ক্ষতিকর কিছু নয়। জাতীয় ইচ্ছা আকাংখা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির অনুকূল হলে, তাতে সংবিধান সংশোধন করাও সহজ হয়। কারণ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আঞ্চলিক আশা-আকাংখা পূরণ ও অধিক লোকের রাজনৈতিক পুনর্বাসন সাধনের অধিক উপযোগী-ইহাও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মানেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন ও তার ধ্বংস সাধন নয়। অনুরূপ দুশ্চিন্তা অমূলক। ইহাও ভাবা উচিৎ নয় যে, ক্ষমতা বিদ্রোহী পক্ষের হস্তগত হলে উহাকে বিচ্ছিন্নতায় রূপান্তর করা সম্ভব। কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক প্রতিনিধি হিসাবে একজন আনুষ্ঠানিক প্রদেশ পাল বা গভর্ণর থাকবেন, যার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন, প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় জরুরী। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত সেনা বাহিনীও থাকবে। বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে, সেই গভর্ণর ও সেনাবাহিনী তাৎক্ষনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম হবেন। তদুপরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্তার কারণে, স্থানীয় বাঙ্গালীরাও, ক্ষমতার ভাগিদার থাকবে, যারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ত রক্ষার সপক্ষীয়

www.pathagar.com

শক্তি। বিদ্রোহীরা তাদের দাবী নামায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই কামনা করেছেন, উপজাতীয় শাসন নয়। যথাঃ

"১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ঔপনিবেশিক অগণতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসন বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই জন্য জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা যথেষ্ট নহে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনসহ দশ ভিন্ন ভাষাভাসী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে।" (সূত্রঃ জনসংহতি সমিতির দাবী নামা (পৃঃ২-৩)

দাবীনামায় দ্বিতীয় প্রধান আপত্তিকর বিষয় হলো, যথাঃ "৩ (ক) ১৭ ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হইতে অত্র দাবীনামা উপস্থাপনের দিন পর্যন্ত (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৭) যাহারা বে-আইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা সমতল ভূমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি বা দেখল করিয়াছে, অথবা পাহাড় কিংবা সমতল ভূমি ক্রয় বন্দোবস্তি ও বেদখল করিযা বসতি স্থাপন করিয়াছে সেই সকল বেআইনী বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া লওয়া।" (সূত্রঃ ঐ -- পৃষ্ঠা ৫) এই দাবীটি ঐতিহাসিক যুক্তি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্ভর। সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষীয় কেহই এতদাঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিব নন। তথ্যহীন ধারণার দ্বারা দাবীটি উথাপিত। এই দাবীটির তথ্য নির্ভর আলোচনা হলে, তার উথাপকরা জব্দ হয়ে যেতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ইতিহাস ও দলিল দস্তাবেজ প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনসাধারণের অধিকাংশ আরাকান লুসাই ও ত্রিপুরা থেকে আগত ইমিগ্রেন্টস বা অভিবাসীদের বংশধর। সুযোগ দান সত্বেও সনদও ভূমি সত্ব গ্রহণের দ্বারা তারা আইনানুগ ইমিগ্রেন্টস ও হয় নি। দাবী অনুযায়ী তারা বংশানুক্রমিক জুমিয়া বা ভূমি স্বত্বহীন যাযাবর লোক। ভূমি স্বত্বই নাগরিকত্বের সনদ, জুমিয়ারা যার অধিকারী নয়। জুমিয়া জাতিত্বের দাবীদারগণ নিজেরাই স্বঘোষিত বেআইনী বহিরাগত। বাঙ্গালীরা আইনানুগ পন্থায়, ভূমি ক্রয় ও বন্দোবস্তি গ্রহণকারী স্বদেশবাসী। ইহাকে বেআইনী অনুপ্রবেশ বা বসতি স্থাপন বলেনা। খাসজমি ভোগ দখল ও চাষাবাদ করার দ্বারা ঐ জমিতে কারো মারিকানা বর্তায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুমিয়াদের কাছে নিষ্কর ইজারা দেওয়াও হয় নি। এখানে স্বদেশবাসী অন্যান্যদের অধিকার রহিতও নয়। ৫২ ধারা খোদ একটি ভ্রান্ত আইন। উহাই স্বঘোষিত জুমিয়াদের ইমিগ্রেন্টস বা বহির্দেশীয় বসতি স্থাপনকারী আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং জুমিয়া জাতির সদস্যরা নিজেরাই স্বঘোষিত বহিরাগত তথা বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। সদ্ভাব সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে

www.pathagar.com

বাঙ্গালী জনগণ তাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ উদারতা নজিরবিহীন। দুনিয়ার কোথাও বহিরাগতরা অবাধ নাগরিকত্বের অধিকার পায় নি। আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের, স্থানীয় জনগণ ধ্বংস প্রাপ্ত ক্ষুদ্র সংখ্যা লঘুতে পরিণত। নতুবা ইউরোপীয় অভিবাসীগণ নিশ্চয়ই তাদের দ্বরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতেন। একারণেই দুনিয়ার সর্বত্র বসবাসকারী এহুদী সমাজ, হাজারাধিক বৎসরের অভিবাসী হলেও, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কোথাও নাগরিকত্বের অধিকারী নয়। ভারতীয়রা শত শত বৎসরের পরও আফ্রিকার দেশে দেশে এবং মহাসাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে বিদেশী নাগরিক হিসাবে গণ্য। চাকমা, মগ ও অন্যান্য অবাঙ্গালী জনসাধারণ, বাংলাদেশের কোন অঞ্চলেরই আদি অধিবাসী নয়। তাদের বহির্গমনের ইতিহাস অনেকের জানা না থাকলেও, এই অজ্ঞতা স্থানীয় হওয়ার দলিল নায়। অবাঙ্গালীরা তাদের ধারণা লব্ধ ঐতিহাসিক ভ্রান্তিতে লিপ্ত, যে কারণে এই হাস্যস্পদ দাবী উত্থাপিত হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীরা বহিরাগত বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। একমাত্র উপজাতি খ্যাত লোকেরাই এখানকার খাটি অধিবাসী এখানে উপজাতিদের ভূম্যাধিকার একক ও অবাধ। কোন বন্দোবস্তি বা ইজারা ছাড়াই তাদের ভৌমিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত।

মনে হয় সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিদ্রোহীদের দাবী ও অস্ত্রের মোকাবেলায় সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা। যদ্দরুণ তাড়াহুড়ার সাথেও বিবেচনাহীন ভাবে স্থানীয় শাসনের বিকল্প গৃহীত হয়েছে যা বিদ্রোহীদের পাঁচ দফার চেয়ে ও বাড়া। ইহা বিবেচিত হয় নি যে, শান্তিবাহিনী ও জন সংহতি সমিতি ব্যতিরেকে, অপর উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। সুতরাং বিকল্প শাসন ও নেতৃত্ব এই ক্ষেত্রে নিষ্ফল।

গৃহীত সরকারী কার্য্যক্রম বিশ্লেষণের দ্বারাই তার দোষ ত্রুটিও নিষ্ফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। বিদ্রোহীদের পাঁচ দফা সম্বলিত দাবী হলোঃ গণতন্ত্র সম্মত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, উপজাতীয় শাসন নয়। এই সাথে প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১/১৯০০ এর বিলোপ কামনা করা ও হয়েছে। কিন্তু সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার নামে নতুন আরেক উপজাতীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন, এবং পুরাতন উপজাতীয় শাসন ও বজায় রেখেছেন, যা উপজাতীয় পক্ষের দাবী নয়। এ হলো চাওয়ার অতিরিক্ত দান যা একা দাতারই সন্তুষ্টির কারণ। এখন এই অসঙ্গতি গুলির সরেজমিনে–তদন্ত–ফলাফল কী তা, জানা দরকার। যথাঃ

(ক) উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটির সম্পাদিত চুক্তি ও স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন।

www.pathagar.com

১। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮তে সম্পাদিত চুক্তিঃ

ধারা খ) রাঙ্গামাটি (খাগড়াছড়ি, বান্দরবন) পার্বত্য জেলা (সমূহের) জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন যে পরিষদ গঠন করা হইবে, তাহাতে উপজাতীয় অধিবাসীদের প্রাধান্য ও সংখ্যা গরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে, উপজাতীয় ও অউপজাতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা, স্থিরকৃত অনুপাতে নির্ধারিত হইবে এবং প্রস্তাবিত জেলা পরিষদে জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় (সম্প্রদায়ের) প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। সর্বোপরি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজাতীয় লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

২। ৫ই অক্টোবর সম্পাদিত চুক্তিঃ

ধারা ৭। আসন বন্টনে জনসংখ্যা ও উপজাতীয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিতেহইবে।

প্রস্তাবিত জেলা কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হইবে অউপজাতীয় নূন্যতম একতৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে উপজাতি এবং অউপজাতীয় সম্মত আসন নিম্নরূপ হইবেঃ

		রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান	
ক) চেয়ারম্যান		১	১	১	জন
খ) চাক্মা	সদস্য	১০	৯	১	"
গ) মারমা + (মগ)/খিয়াং	"	৪	৬	১০	"
ঘ) তনচংগ্যা	"	২	০	১	"
ঙ) ত্রিপুরা + উচাই	"	১	৬	১	"
চ) চাক (সেক)	"	০	০	১	"
ছ) লুসাই	"	১	০	১	"
জ) পাংখো + বোম	"	১	০	০	"
ঝ) খেয়াং	"	১	০	০	"
ঞ) খুমি	"	০	০	১	"
ট) অউজাতীয়	"	১০	৯	১১	"
ঠ) মুরুং (ম্রু)	"	০	০	৩	"
	মোট	৩১	৩১	৩১	জন

www.pathagar.com

বিষয় বিভক্তি করণঃ বিষয় বিভক্তি করণ সম্পর্কে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহ জেলা কাউন্সিলের অধীনে পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেনঃ

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা
২। প্রাইমারী শিক্ষা
৩। ইউ, এস, এফ (Unclassed state Forest)
৪। মৎস্য ও পশু পালন
৫। কৃষি
৬। সমবায়
৭। পুলিশ
৮। লাইসেন্স পারমিট (স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত)
৯। উপজাতীয় সামাজিক আইন
১০। জেলার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত (বিষয়)
১১। সংস্কৃতি ও খেলাধুলা
১২। বাজার ফান্ড/হাটবাজার।

(খ) ইহার বিপরীতে গৃহীত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনঃ ধারা ২। সংজ্ঞাঃ (খ) উপজাতীয় অর্থঃ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ও বান্দরবান জেলায় স্থায়ী ভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ম্রো (মুরং) বোম, খুমি, উচাই ও চাক উপজাতির সদস্য।

ধারা ২৪ (২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে।

ধারা ৩১ (১) রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলার ডিপুটি কমিশনারগণ পদাধিকার বলে (সংশ্লিষ্ট পরিষদের) সচিব হইবেন।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে; পরিষদের সভা আহবান, সভা পরিচালনা ও সভার কার্যসুচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

ধারা ২২। পরিষদের কার্যাবলী। প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী, পরিষদের কার্যাবলী হইবে এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদনকরিবে।

www.pathagar.com

প্রথম তফসিলঃ

পরিষদের কার্যাবলীঃ

১। জেলার আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, উহাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও হিসাব নিরিক্ষণ, উহাদিগকে সহায়তা সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা।

৪। স্বাস্থ্য।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার।

৬। কৃষি ও বন।

৭। পশুপালন।

৮। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণা বেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য

১১। সমাজকল্যাণ।

১২। সংস্কৃতি।

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে, এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। উদ্যান, খেলার মাঠ ও উম্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাক বাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন।

১৭। উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয় নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

www.pathagar.com

ধারা ৬৪।। ভূমি হস্তান্তরে বাধা নিষেধ। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উপরোক্ত কোন জায়গা জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তিকৃত জায়গা জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

পর্যালোচনাঃ

২৪(২) ও ৩১(১) ধারা দুটি বিভ্রান্তিকর ও সরকারী দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অসুবিধা জনক। আইনতঃ পরিষদের চেয়ারম্যান ক্ষুদ্র মেয়াদ ভিত্তিক একজন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, যার ক্ষমতার পরিধি সীমাবদ্ধ, কিন্তু জেলা প্রশাসক সরকারের মূখ্য প্রতিনিধি ও প্রশাসক। তিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় আইনে তিনি অসীম ক্ষমতাধর। জেলায় কর্মরত সব নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর অধীন ও অধঃস্তন। তবে ৩১(১) ধারা অনুযায়ী তিনি পরিষদের সচিব ও মামুলী দায়িত্বের অধিকারী। মান-মর্যাদায়ও তিনি চেয়ারম্যানের ছোট। সুতরাং উভয়ের অবস্থান দ্বান্দ্বিক। ইহা সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের অনুকূল নয়। চেয়ারম্যান কার্যতঃ প্রতিনিধি ও উপ-মন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত হলেও ক্ষমতায় জিলা প্রশাসকই প্রধান। তিনি জিলার প্রধান নির্বাহী আমলার ক্ষমতা বলে জরুরী মুহূর্তে সরকারের পক্ষে চেয়ারম্যান ও পরিষদের বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। সার্বক্ষণিক একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, জিলা প্রশাসকের এই প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রশাসনের স্বার্থে এই প্রাধান্য অপরিহার্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, নেতৃবৃন্দ আংশিক ক্ষমতা লাভে ও সম্মত ছিলেন। চুক্তিবদ্ধ সিদ্ধান্তেরই অনুসরণে স্থানীয় সরকার পরিষদের ব্যবস্থা পরিকল্পিত, উহার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বিধান রচিত, জাতীয় সংসদে তা গৃহীত এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। অসঙ্গতিগুলি নিম্নরূপঃ- ক) চুক্তিবদ্ধ ১২টির স্থলে ২২টি বিষয় পরিষদের দায়িত্বাধীন হয়েছে। আংশিক ক্ষমতা ও বিবেচিত হয় নি।

www.pathagar.com

খ) সংজ্ঞায় ব্যক্ত উপজাতি পরিচিতি, ইতিহাস, আইন ও নৃতত্ত্বকে অনুসরণ করে নি । উপজাতির তালিকা ও প্রতিনিধিত্বের তালিকা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীন। কতিপয় যথার্থ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্বের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয় নি । মূলতঃ আইন অনুযায়ী চাক্‌মা মারমা (মগ) নেপালী, আসামী ইত্যাদি কতিপয় সম্প্রদায় উপজাতি নয়। শুধু উপজাতি হওয়া সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আইনানুগ সুত্র ও নয়। এই সাথে স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী হওয়ার শর্ত জড়িত। যথাঃ-ভারতীয় আয়কর আইন১১/১৯২২ঃ

Shall apply to all persons in the chittagong Hill Tracts except the indigenous Hillmen.

গ) জিলা প্রশাসকের অধীনতা ও ক্ষমতাহানি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ক্ষমতার ভার সাম্যের ক্ষেত্রে ইহা অবশ্যই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। চুক্তির সীমা লঙ্ঘন করে জিলা প্রশাসককে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

ঘ) জনসংখ্যা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচন সুনিশ্চিত হয় নি। এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ভোটের ক্ষমতা রহিত হওয়া দরকার।

ঙ) শুধু উপজাতীয়দের জন্য চেয়ারম্যান পদের সীমা-বদ্ধতা অন্যায় আর অগণতান্ত্রিক।

ব্যবস্থাটি প্রবর্তন কালে ইহা বিবেচিত হয় নি যে, বিদ্রোহীদের কাছে, স্থানীয় উপজাতীয় জনসাধারণ অসহায় জিম্মি। তারা বিদ্রোহীদের আন্দোলনের সুফল ভোগী পক্ষ ও বটে। বিদ্রোহীদের বিপক্ষে এদের সংগঠিত করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। সুতরাং অনিশ্চিত ব্যবস্থার পিচনে ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যয়, নিজেদের হয়রানীরই শামিল। তার চেয়ে সহজ ব্যবস্থা হলোঃ পরিস্থিতির জন্য দায়ী পক্ষকে শান্ত করা। কোন বড় রকমের ছাড় দেওয়া ছাড়াই, তাদের উত্থাপিত পাঁচ দফার আওতায়, শান্তিপূর্ণভাবে শান্তি স্থাপণ সম্ভব। তার বিপরীতে স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপণ হটকারী ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে প্রমানিত হয়েছে যে, ইহা শান্তির প্ল্যাট ফরমে পরিণত হতে অপারগ। যতই আশাবাদ ব্যক্ত করা হোকঃ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে ইহা সক্ষম নয়। বিদ্রোহীদের মূল্যায়ণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের যথার্থ বিকল্প নয়। সম্প্রতি তারা দাবী দাওয়ার প্রশ্নে ছাড় দিতেও আলোচনার দ্বারা মীমাংসায় পৌছাতে আগ্রহী। এখন আপোষ মীমাংসায় পৌছা অথবা সামরিক হস্তক্ষেপ ও দ্রুত সপক্ষীয় জনশক্তির দ্বারা বিজয় অর্জনই সমস্যা সমাধানের উপায়। এর কোন বিকল্প নেই। এর বিপরীতে দীর্ঘস্থায়ী সেনা শাসন

www.pathagar.com

কারো পক্ষেই স্বস্তিকর নয়। তবে সেনা উপস্থিতি ও জরুরী। তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না।

বাঙ্গালী পূণর্বাসনের পক্ষে যুক্তি হলো; দেশের ১০% অঞ্চল হিসাবে, বার্ষিক বর্ধিত জনসংখ্যার ১০% লোকের ভূমি সংস্থান, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগে পড়ে। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ায় বাস্তুচ্যুত হবে এরূপ নাগরিকদের ও ১০% লোক এই পর্বতাঞ্চলে পুনর্বাসন লাভের অধিকারী।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এতদাঞ্চলের ভূমির ধারণ ক্ষমতা বেশী। সারা দেশের তুলানায় এখানে জনঘনত্ব ২০০০ এর বিপরীতে ২০০ মাত্র। পাহাড়ের চূড়া-খাদ, সংরক্ষিত বনাঞ্চল আর হ্রদ বাদ দিলেও এখানে প্রতিবর্গ মাইলে জন ঘনত্ব ৩০০ জনের বেশী হবে না।

(মে ১৯৯২ ইং)

www.pathagar.com

সন্ত্রাস দমন ও স্থানীয় সরকার পরিষদ

শান্তির কামনায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় কম ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। তবু সন্ত্রাস অব্যাহত গতিতে চলছেই। এরশাদ সরকার, সন্ত্রাস বিরোধী স্থানীয় সংগঠন ও শক্তিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে, শান্তি প্রক্রিয়ার আওতায়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমান সরকার ও সে ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে তিন স্থানীয় সরকার পরিষদকে চূড়ান্ত ভাবে ২২টি ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি। বড় আশা ছিলো, স্থানীয় সরকার পরিষদকে প্লেটফরম করে সন্ত্রাস দমন ও শান্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শুধু ক্ষমতা লাভের তাকিদ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মহড়া। গাড়ী ক্রয়, বাড়ী নির্মাণ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধান এবং প্রশাসন ও উন্নয়ন মূলক তৎপরতায় নিজেদের সম্পৃক্ত করণ ইত্যাদি, যে সব কাজ সম্পাদনে বহু সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। জন্মগত দায়িত্ব শান্তি স্থাপণের ব্যাপারটি সর্বাধিক জরুরী হলেও তা অবহেলিত। শ্রুতিমধুর সন্ত্রাস বিরোধী কিছু নিন্দাবাদ মূলক বাহ্যিক বিবৃতি দান মাত্রই সার। কোন পরিষদই আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও সন্ত্রাস বিরোধী কোন পরিকল্পনা গ্রহণের নজির স্থাপন করে নি । ইহা লজ্জ্যা জনক ব্যর্থতা।

নিরাপত্তা বাহিনী গুলি নিশ্চেষ্ট নয়। তাদের পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে সন্ত্রাসীরা কোণঠাসা। নতুবা সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে পড়তো, বসবাসের অযোগ্য এক অরাজক অঞ্চল। তারা নিজেদের কষ্ট ও প্রাণের বিনিময়ে দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সন্ত্রাস দমন কোন নিয়মিত যুদ্ধ নয়। অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার ব্যাপ্তি ও তৎপরতাকে মোকাবেলা করা একটি দুরূহ কাজ। তদুপরি এর সাথে রাজনীতি জড়িত, যা তাদের বিবেচনার বিষয় নয়। সুতরাং একক ভাবে সৈন্য মোতায়েন ও তাদের অনিয়মিত অভিযানের দ্বারা, সন্ত্রাস নির্মূল করণ সম্ভব নয়। এর সাথে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণও জরুরী। সেই সহযোগী ব্যবস্থারই প্লেট ফরম হিসাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ পরিকল্পিত। তাদের উচিত শুধু ঘি খাওয়া নয়, গুলি বন্দুক দমানোরও ব্যবস্থা করা।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিদ্রোহীরা ক্ষেপা। তারা এই তিন পরিষদকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করে। দীর্ঘ দিন থেকেই তাদের বিরোধীতার

www.pathagar.com

কথা জানিয়ে বর্ণিত তিন পরিষদ বাতিলের দাবী জানাচ্ছে। আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করাই হয়তো তাদের লক্ষ্য। ইহাও সত্য যে, এই পর্বতাঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য একমাত্র বিদ্রোহীরাই দায়ী। পরিবেশকে শান্ত করনে তাদের ভূমিকা ও স্বীকার্য। সুতরাং সরকার ও বিদ্রোহীদের বাদে কোন তৃতীয় শক্তি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকারের আকাংখিত তৃতীয় শক্তি হিসাবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পরিষদ গুলি ব্যর্থ হয়েছে। তাদের লক্ষ্য শান্তি নয়, আরো ক্ষমতা, আরো সুযোগ সুবিধা। কেন বিদ্রোহীদের ক্ষেপানো? নিরিহ ভাবে শুধু লাশ টানা আর ধৈর্য্য ধারণ বিরক্তি কর। মীমাংসার পক্ষে বিকল্প কিছু ভাবা দরকার।

সরকারী পক্ষ থেকে, উপজাতীয় পক্ষকে, শান্তির পক্ষে অবদান রাখার অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভূমিহীনদের ব্যাপক পুনর্বাসনের মাধ্যমে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যের অবসান করা এবং সামরিক অভিযানের দ্বারা বিদ্রোহীদের বাছাই ও নির্মূল করণের সরকারী কর্মসূচী নেহাত অনুগ্রহ বশতঃই গত কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ। তদুপরি সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা, শান্তির পক্ষে অবদান রাখার লোভনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনও করেছেন। বলতে গেলে এতদাঞ্চলে উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধার ঢল বইছে যা অনুন্নত গরীব বাংলাদেশের অন্যত্র, দর্শনীয় নয়। এইসব ছাড় ও সুবিধাদির বিনিময়ে কোন সুফলই পাওয়া যায় নি। বিদ্রোহ আর বাড়াবাড়ি যথা পূর্ব অব্যাহতই আছে। এই বিচারে উপজাতিদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাদি সুফলদানে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্রোহের দীর্ঘ সময়কাল নেহাত কম নয়। বিদ্রোহের বিরোধী বলে কথিত সুবিধা ভোগী লোকেরা, যথেষ্ট সরকারী মদদ লাভও করেছেন। নিষ্ফল প্রমানিত সে মদদের আর কোন মূল্য নেই। উহা অব্যাহত রাখা নিষ্প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলোঃ স্থানীয় সরকার পরিষদ কী রাজনৈতিক ভূলের ফসল? এরশাদ সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি আসলে কী সুপরিকল্পিত। জন্মগতভাবে ইহা সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের অধিকারী সংগঠন, এবং ইহার জন্ম বৃত্তান্তটি ও সুখকর নয়। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা, স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গ সংগঠন শান্তি বাহিনীর দ্বারা বিঘ্নিত। মরহুম জিয়াউর রহমানের সরকার প্রথমে আপোষে বিষয়টির মীমাংসার চেষ্টা করেন, কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টির বিদ্রোহাত্মক ভয়াবহতায় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হোন। উহারই ফল হলোঃ নিরাপত্তা জোরদার করণ, স্থানীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও বাঙ্গালী পুনর্বাসন। এরশাদ সরকার, হুট করে শুধু বাহ্‌বা পাওয়া ও ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যেই, সে প্রতিকারী কর্মসূচীগুলো স্থগিত করে দেন। শুরু হয় মীমাংসার আলোচনা। কিন্তু ঐ আলোচনাটি ও যথেষ্ট ধৈর্য্য বিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ছিলো না।

www.pathagar.com

সুতরাং তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরে শুরু হয়, বিদ্রোহীদের বাদ দিয়ে, কিছু সুবিধা সন্ধানীদের নিয়ে একটি বিকল্প প্রতিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা, যাদের লক্ষ্য হলো সরকারী মদদে বিদ্রোহীদের বিপক্ষ শক্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিদ্রোহীদের জনবিচ্ছিন্ন করে শান্তির নিশ্চয়তা বিধান। কিন্তু আজ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সরকারী মদদ প্রাপ্ত ঐ সুবিধা ভোগীরা, স্থানীয় সরকার পরিষদের আওতায় শুধু নিজেদেরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শান্তি প্রক্রিয়া বাদে তারা গোটা প্রশাসনকেই দখলের পায়তারা করছেন।

চরিত্রগত ভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলি সুবিধা বাদী ও দুর্নীতিতে দুষ্ট। কতিপয় বাছাই করা অনুগৃহীত লোককে, লক্ষ লক্ষ টাকার নির্বাচনী অনুদান যুগিয়ে, ভোটারহীন নির্বাচনের মাধ্যমে, ক্ষমতায় বসান হয়েছে। তাদের পরণের পোষাক গুলিও সরকারী অনুদানের টাকায় কিনা। তারা শান্তি বাহিনীর ভয়ে ভীত, নিরাপত্তা–কাতর ও লোভী। দুঃসাহসী শান্তি প্রক্রিয়াকে জোরদার করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় নি । শান্তির কোন কর্মসূচী ও তাদের দায়িত্বে অন্তর্ভূক্ত নেই। বস্তুতঃ পক্ষে তারা মরহুম শেখ সাহেবের কথিত আরেক চাটার দল। লুটে পুটে খাওয়াই তাদের কাজ। আজ পর্যন্ত গৃহীত তাদের উন্নয়ন প্রজেক্ট গুলির অধিকাংশই ভূয়া প্রমানিত হয়েছে। কাজের নামে এভাবে বিপুল খাদ্য শস্যের লোপাট, বিরাট দুঃখজনক ঘটনা। সরকারী অর্থের এরূপ দুর্নীতি পূর্ণ ব্যবহার অতিব বেদনা দায়ক।

সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায় নি । অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটছে। পার্বত্য সন্ত্রাসী সমস্যাটিও সহজ সরল অবহেলা যোগ্য ছোট খাটো কিছু নয়। ইহা বিব্রতকর অন্যতম বৃহৎ জাতীয় সমস্যা। ইহা নিরিহ জনসাধারণ ও তাদের সহজ সরল সাধারণ নেতৃবৃন্দের সৃষ্ট কোন জটিলতা নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিও তজ্জন্য দায়ী নয়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী কতিপয় নেতা ও যুবক সাংগঠনিক ভাবে একত্রিত হয়ে বিদেশী শক্তির মদদে, এক অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যাকে কেউ বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদ, কেউ বলেন সন্ত্রাসী তৎপরতা, এবং তার হোতাদের আখ্যায়িত করা হয় সন্ত্রাসী বিদ্রোহী বলে। সুতরাং যারা অশান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী, তারাই শান্তি স্থাপণের মাধ্যম, অন্য কেহ নয়। যদি শান্তি স্থাপণ আদৌ জরুরী বিবেচিত হয়, তখন হয় সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করে দিতে হবে, নয়তো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বশে আনতে হবে। অতীতে এই দুই পন্থারই অনুসরণ করা হয়েছে, তবে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিজ্ঞতাকে যথেষ্ঠ ভাবে কাজে লাগান হয় নাই। এখন পুনরায় শান্তি–পূর্ণ মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, যাতে বিবদমান পক্ষ গুলি সশস্ত্র তৎপরতা থেকে বিরত হয়ে, আলোচনার বৈঠকে

www.pathagar.com

ফিরে আসে। বিবাদটি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক, যাই হোক, মোটেও মীমাংসার অযোগ্য নয়। রক্ত অনেক ঝরেছে, প্রাণ অনেক গেছে, তদ্বারা কোন পক্ষেরই সাফল্য বা লক্ষ্য অর্জিত হয় নি। এখন সাময়িক অস্ত্র সম্বরণের ব্যবস্থা হোক। আলোচনার মাধ্যমে বৈঠকে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অর্জনে সচেষ্ট হতে ক্ষতি কী? সম্ভাব্য ব্যর্থতায় বিকল্প মীমাংসার কথা ভাবা যাবে।

প্রচলিত শান্তি প্রক্রিয়া ও প্রতিরোধের দ্বারা সন্ত্রাস দমিত হচ্ছেনা। তার প্রমান চলমান বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা। আজ কাল পরশু এবং তার পর ও ঘটনার পর ঘটনা অব্যাহত থাকা দুশ্চিন্তার বিষয়। নিন্দাবাদ আর প্রথা-সিদ্ধ প্রতিরোধ ভরসা যোগ্য নয়। আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

শান্তিরক্ষী বাহিনী গুলির বিপরীত অবস্থানে সংগোপনে সন্ত্রাসীদের টিকে থাকা সুখ কর নয়। ইহা উভয়ের সহাবস্থানের নামান্তর। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দীর্ঘ-সুত্রিতা দুঃখজনক। শুধু পাহারা দেওয়া, অতর্কিতে ক্ষয় ক্ষতি হজম করা আর নির্বিবাদে লাশ টানার কোন মানে হয় না। বাঁচার অন্য কার্যকর উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হওয়া দরকার। কার্যকর অন্য সফল কৌশলের অভাব স্বীকার করা যায় না।

ইহা জানা কথা যে, সন্ত্রাস সীমান্ত পার থেকে পরিচালিত। অস্ত্র অর্থ বুদ্ধি আর আশ্রয় লাভের ঐ কেন্দ্রটি, অত্যন্ত শক্তি শালী। সন্ত্রাসীরা তাতেই বলিয়ান। ঐ বিদেশী শক্তিকে না ক্ষেপিয়ে, উভয়ের যোগাযোগ কে বিচ্ছিন্ন করাও ঘরের শত্রুদের বেকায়দায় ফেলে কাবু করার কৌশল নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। অস্ত্র আর কূট কৌশলের সমন্বয়ের দ্বারা সাফল্য লাভ সম্ভব। ঐ কৌশলের অন্যতম হলোঃ সীমান্তকে স্বপক্ষীয় মানব দেওয়ালের দ্বারা নিচ্ছিদ্রভাবে সীল করে দেওয়া। পর্বতাঞ্চলের অভ্যন্তরে নয়, সীমান্ত জুড়ে অন্ততঃ পাঁচ মাইল গভীর ঘন বাঙ্গালী জনবসতি গড়ে তোলা গেলে, নিচ্ছিদ্র এক মানব দেওয়াল গঠিত হবে, যে প্রতিরোধ ডিঙ্গানো সন্ত্রাসীদের পক্ষে সহজ হবে না। তৎপর বিচ্ছিন্ন হতবল সন্ত্রাসীদের বেছে নেওয়া হবে সহজ কাজ।

কাজটির বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে আপত্তি উঠবে। বিভ্রান্ত, দুর্বল আর কুচক্রীরা যুক্তি দেখাবে যে, যেহেতু উপজাতিরা বাঙ্গালী পুনর্বাসনের উপর ক্ষেপা, সেহেতু উহাও শক্তিশালী ও বিপর্যয়কর প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। কিন্তু এর মুল্যায়ন ভিন্নভাবে ও করা যায়। অধিকাংশ সীমান্ত অঞ্চলই সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বা জন বসতি হীন দুর্গম এলাকা তাই, উপজাতীয় জনগণের তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলাযায়।

www.pathagar.com

বিরোধীয় এলাকাগুলি থেকে ও সীমান্ত বসতির উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করা যাবে, এবং সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে উপজাতিদের বাঁচাতে, সীমান্তের বাঙ্গালী বস্তি গুলি, কার্যকরী ভূমিকা রাখতেও সক্ষম হবে, সুতরাং কাজটি গ্রহণ যোগ্য, উপকারী। এই পরিকল্পনাটি, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একমাত্র বিকল্প নয়, সহায়ক। আলাপ আলোচনার দারা বিদ্রোহীদের শান্তকরণ কাজটি অব্যাহত রাখাও জরুরী। চির দিনের জন্য সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে ইহার প্রয়োজন আছে।

পাহাড়ী গণ পরিষদ ও ছাত্র পরিষদের সমস্যগণ, নিজেদের আন্দোলনের চরিত্রকে, নিজেদের অজান্তে সন্ত্রাসী রূপ দান করে, খামোখা নিজেদের সন্দেহভাজন করছেন। তাদের দাবী গুলি সন্ত্রাসীদের দাবীর কার্বণ কপি না হলে, বিভ্রান্তির সৃষ্ঠি হতো না। যে কোন দাবী ও আন্দোলনের পক্ষে যুক্তি থাকা স্বাভাবিক, এবং সে যুক্তির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও থাকা সম্ভব। সবার পক্ষে এক মত ও পথের অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে প্রত্যেককেই নিজের স্বতন্ত্র মত ও পথকে অনুসরণ করতে হবে। এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাগরিক দায়িত্ব। গণপরিষদ ওলারা ও এ দেশের নাগরিক। বাংলাদেশী জাতির মাত্র ০·৪৫% হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসী উপজাতি। অন্যান্য জিলার উপজাতি ও আদিবাসীদের সংখ্যা ০·৫৫%। আর ৯৯% হলো বাঙ্গালী। বলতে গেলে বাঙ্গালীদেরকে নিয়েই গঠিত দেশ জাতি সরকার ও প্রশাসন। আধা শতাংশ উপজাতীয়দের কিছু লোকের, দেশের রাজধানীতে সরকার প্রদত্ত আরাম আয়েশে বস-বাস করে এমন দাবী করা কি সঙ্গত, দ্বারা বাঙ্গালী অধিকার ও ননোভাবে আঘাত লাগে? বাঙ্গালী অধিবাসীদের না ক্ষেপিয়ে, যুক্তির মাধ্যমে তাদের সহানুভূতি জাগিয়ে, পাহাড়ী জন-গণের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় করাই, স্থানীয় রাজনীতির কৌশল হওয়া উচিৎ। অথচ গণপরিষদওলা কতিপয় পাহাড়ী রাজনীতিক, শুধু চমক লাগানোর উদ্দেশ্যে এমন সব দাবী দাওয়া নিয়ে রাজধানীর নিরাপদ ও আরাম দায়ক আশ্রয়ে মিটিং মিছিল ও সমাবেশ করেন যা অনেকাংশে বিদ্রেহীদেরই দাবী দাওয়ার প্রতিধ্বনি। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিদ্রোহী পক্ষে পরিণত করছেন। খামোখা এই পরিচিতি গ্রহণ তাদের এক মস্ত বড় ভূল। এর জন্য তাদের দুর্ভোগের শিকার হওয়া অনিবার্য্য। যারা সীমান্তের ওপারের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করে, বিদেশী সার্থে পরিচালিত হয়ে, চুপিসারে এপারে এসে সন্ত্রাস চালায়, ও পুনরায় পালিয়ে যায়, দেশের মাটিতে, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে, একই রাজনীতি করা বিপজ্জনক। নিরিহ অপরিপক্ষ ছাত্র ও যুবকেরা হুজুগে মেতে চমক লাগিয়ে, কোন সুফল আশা করতে পারেনা। যদি রাজনীতি করতেই হয় তবে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ধারার প্রবর্তণ অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

যদি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি আপনাদের সে আশা আকাংখা পুরণে ব্যর্থ হয়, তা হলে জাতীয় চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে, শুধু উপজাতিদের নিয়ে নয়, সার্বজনিন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সংগঠন করুন সোচ্চার হোন, দেশবাসী আপনাদের স্বাগত জানাবে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের দোষ ত্রুটি একশত বার স্বীকার্য্য।তার আলোচনা করুণ ও সংশোধনের পরামর্শ দিন। সবাই আপনাদের সমর্থন জানাবে। গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ইহা প্রবর্তিত। ইহাকে ত্রুটি মুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করতে মেধা খাটান। শুধু সমালোচনা ও বাঙ্গালী উচ্ছেদের উত্তেজক দাবী উথাপনঅযৌক্তিক।

বাঙ্গালীরাও এ দেশের সন্তান, এদেশে ছিলো এবং থাকবে, ইহা প্রতিষ্টিত সত্য। তাদের অস্তিত্ব আর অধিকার অস্বীকার করা অবাস্তব। একই সাথে উপ জাতিরাও এ দেশের সন্তান, এ দেশে ছিলো, এবং থাকবে, তাদের অধিকার অস্বীকার করা ভূল। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার বিদায় দিতে হবে। যারা ভুল ও সংঘর্ষের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করেছে, তাদের জন্য ভুল স্বীকার করার ও দেশে ফিরার সময় বেঁধে দিতে হবে। তৎপর তাদের দায় দায়িত্ব আর জাতির উপর বতাবেনা। রাজনীতি থেকে উপজাতীয়তাকে বিদায় দিতে হবে। এখানে রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে, আরো উদার ও প্রসারিত হতে হবে। বিদ্রাহী আর সন্ত্রাসীদের ভাষার কথা বলা ভূল। তারা পরবাসী, আর আমরা স্বদেশের মাটির বাসিন্দা। আমাদের বসবাস ও চিন্তা চেতনার পরিবেশ ভিন্ন। ক্ষুদ্র উপজাতীয় দরদকে স্বদেশীয় সীমায় ধরে রাখাই উত্তম। নতুবা ভূল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকবে। অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতা, পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ়হতে দিবে না। স্থানীয় সরকার পরিষদের গঠন পদ্ধতি দোষ ত্রুটি মুক্ত নয়, উহা জন্মদোষে দুষ্ট। ঐ দোষের প্রতিকার তার বিলোপ সাধন নয়। তাড়াহুড়ার ভিতর উহার গঠন পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। সে কারণে শান্তির কোন কর্মসূচী উহার মুল গঠন কাঠামোতে ভূল বশতঃ অন্তর্ভূক্ত হয় নি । তাই উহা বর্তমানে শুধু বহুতর ক্ষমতায় ভারাক্রান্ত। শান্তি স্থাপণ উহার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। অথচ এর জন্ম উদ্দেশ্যই শান্তি স্থাপন।ক্ষমতা তার সহয়োগী বাড়তি পাওনা মাত্র। সংশোধনের জন্য এই ত্রুটি উদ্‌ঘাটন স্থানীয় রাজনীতির দায়িত্ব। স্থানীয় সরকার পরিষদকে টিকিয়ে রাখার মাঝে বৃহৎ স্থানীয় স্বার্থ জড়িত। যেহেতু সাংবিধানিক ভাবে দেশ এককেন্দ্রিক, সেহেতু প্রাদেশিক শায়ত্ত শাসনের বিকল্প হিসাবে ইহা এতদাঞ্চলের পক্ষে বিশেষ রাজনৈতিক সাফল্য। এই ব্যবস্থাকে বানচাল করা ক্ষতিকর।

www.pathagar.com

ইহা সীকার্য যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সমান বিকল্প নয়। তবে চরিত্রে ও ক্ষমতায় কম হলেও ইহা শূণ্যতার ভিতর বিরাট এক পাওনা যাসারা দেশে অনন্য।

পাহাড়ী গণ পরিষদ ও ছাত্র পরিষদের আরেকটি দাবী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এটির সাথে বিদ্রোহী সন্ত্রাসী পক্ষের সম্পৃক্ততা প্রত্যক্ষ নয়। বাহ্যিক ভাবে মনে হয়, দাবীটি তাদের দুর্ভোগ-জাত নিজস্ব। কিন্তু আসলে ইহাও বিদ্রোহী পক্ষের বক্তব্যের উপজাত। দাবীটি হলোঃ উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য প্রদেয় শিক্ষা আসনের বন্টন চট্টগ্রাম সেনা নিবাস থেকে প্রত্যাহার করা। তাদের এই দাবীটির পিচনে কী যুক্তি আছে, তা পরিস্কার নয়। এ কারণে এটিকে তাদের সেনা বিদ্বেষ ভাবার অবকাশ আছে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সেনা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায়ই নিয়োজিত নয়, বহুবিধ কল্যাণকর কাজ ও তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যদ্বারা উপজাতিরা বিপুল ভাবে উপকৃত। সেনা বাহিনীর সুপারিশে বিপুল সংখ্যক বেকার উপজাতীয় যুবক যুবতীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাটি আর চাকুরী নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করেও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যে নিযুক্তিগুলির সংখ্যা অনেক। সেনা বাহিনী তাদের মৈত্রী কার্যক্রমের আওতায়, বহু সংখ্যক শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে যাতে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীগণ উপকৃত হোন। সেনাবাহিনীর সুপারিশে অসংখ্য উপজাতীয় অপরাধীদের জেল থেকে মুক্তি এবং অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বহু স্কুল ও কিয়াং সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নির্মিত ও পুনরনির্মিত হয়েছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইহা হামেশাই প্রত্যক্ষ করা হয় যে, স্থানীয় সেনা দপ্তরগুলি থেকে উপজাতীয় উমেদারগণ নগদ ও বৈষয়িক সহায়তা লাভ করে থাকেন। বিষয়টি অনিয়মিত হলেও, সংখ্যায় ও পরিমানে কম নয়। সেনাবাহিনীর স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র গুলি, উপজাতীয়দের জন্য সার্বক্ষণিক দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুল্য মানের নিরিখে ইহাও নগণ্য নয়। বাঙ্গালীদের উপর অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিটি হামলায়, সেনাবাহিনী রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উপজাতীয়দের ক্ষয় ক্ষতি হতো ব্যাপক। সর্বোপরি সেনাবাহিনী ঘন-সন্নিবেশিত না হলে, বাঙ্গালী উপজাতি নির্বিশেষে সবাই সন্ত্রাসীদের প্রত্যক্ষ জিম্মিতে পরিণত হতেন। আপন জন হলেও, সন্ত্রাসীদের হত্যা লুটতরাজ ও, অত্যাচার থেকে উপজাতিরা কখনো রেহাই পান নি । তবে হাঁ গোলাপের সাথে কাঁটাও থাকে। সেনাবাহিনীকে ক্ষেপালে আঘাত পেতে হয়। না ক্ষেপিয়ে গা ঘেষলেওতারঝাঁজে আহত হতে হয়। এতটুকু সহ্য করা

www.pathagar.com

ছাড়া উপায় কী? দুষ্কৃতিকারীদের ঠেকাবার জন্যই সেনা-বাহিনী। এদের নিরিহ গোবেচারা ভাবা অনুচিত। আগে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীদের ঠেকান দরকার তৎপর সেনা বাহিনী আপনা আপনি বেরেকে ফিরত যেতে বাধ্য। তাদের তখন আর জনজীবনের সাথে জড়িত থাকার পরিবেশ থাকবেনা।

স্থানীয় সরকার পরিষদের দোষ ত্রুটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশোধনের সোপারিশ করা অবশ্য কর্তব্য,-তবে গোটা ব্যবস্থাটির নাকচ কামনা করা অসমীচীন। তবে ইহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে স্বীকার করা যায় না যে, উপজাতীয়দের জন্য একক ভাবে চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষিত থাকবে। ক্ষুদ্র উপজাতীয় সংখ্যা লঘুরা ও এই পদটি থেকে সংখ্যাল্পতার গুণে চিরকাল বঞ্চিত থাকবে। বৃহৎ উপজাতীয় জনগোষ্ঠির শুধু চাকমাও মার্মারা সংখ্যাধিক্যের কারণে এই পদটিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে হামেশা প্রয়াস পাবে। সুতরাং পদটি শুধু চাকমাও মার্মার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে, অধীনও শাসিত জনগোষ্টিতে পরিণত হওয়া ছাড়া উপায় কী। এখানেও গণতান্ত্রিক অধিকার লঙিঘত। অবাধে গণতন্ত্র চর্চাও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়া, জনজীবন থেকে অহমিকা আর হীনমন্যতার অবসান হবেনা। সমানাধিকারের চর্চা গণতান্ত্রিক বিধি বিধানে সম্পৃক্ত করা গেলে শ্রদ্ধাবোধ ও সহন শীলতার প্রয়োগ সম্ভব হবে নতুবা একদল অহমিকায় এবং আরেকদল হীন-মন্যতায় ভুগবে। তাতে রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে সুসম রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উপায় হিসাবে, চেয়ারম্যান পদটি, সব সম্প্রদায়ের জন্য ঘূর্ণায়মান করা উচিত। যদি চেয়ারম্যান পদটি সব সম্প্রদায়ের জন্য ঘূর্ণায়মান করা যায়, তাতে সংখ্যাল্পতার কারণে কেউ বঞ্চিত, আর সংখ্যাধিক্যের গুণে কেউ তার চির অধিকারী হতে পারবে না। অহমিকা, হীনমন্যতা, আর সাম্প্রদায়িকতা চর্চার অবসান এতে নিহিত। ভোটাধিক্যে নয়, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সাম্প্রদায়িক বিষয় গুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী।

বর্ণিত ত্রুটিগুলির অবসান হওয়া ছাড়া গোটা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং তার মুল লক্ষ্য শান্তি প্রতিষ্ঠাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সুতরাং শান্তির একটি কর্মসূচী এর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। শান্তির দায়িত্ব পালন ছাড়া কেবল ক্ষমতা ও সম্পদে ভারাক্রান্ত থাকলে, ইহা আভ্যন্তরিন কোন্দল, ক্ষমতা প্রদর্শন ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হবে। ক্ষমতার ভাগীদার সমূদয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি স্বতন্ত্র হওয়ায় প্রশাসনিক ও এখতিয়ার ভিত্তিক কোন্দলের সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব।

www.pathagar.com

সুতরাং এখতিয়ারের পুর্নবিন্যাস করা প্রযোজন। একই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পরিষদের দ্বৈত শাসন ও এখতিয়ার সাং-ঘর্ষিক, ইহা অবাঞ্ছিত। স্থানীয় সরকার পরিষদ সহ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গুলি, মর্যাদায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চরিত্র সম্পন্ন বেসরকারী। এগুলি ক্ষমতায় ও মর্যাদায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও সংগঠনগুলির সমান নয়। স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। অথচ স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলি তিন পার্বত্য জেলার, সর্বক্ষেত্রে মুরব্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক প্রতিনিধি জিলা প্রশাসকগণ, স্ব-স্ব জিলায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। সর্বোচ্চ সমন্বয় কারীর ভূমিকা কার প্রাপ্য, ইহাও সুনির্দিষ্ট নয়। এই নৈতিক ও প্রশাসনিক বিভ্রান্তি, গোটা প্রশাসন-যন্ত্রকে সিদ্ধান্তহীনতায় পতিত করেছে। ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা ও জিলা ভিত্তিক স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলি, একই চরিত্রের জন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এই স্বায়ত্তস্বাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় সরকার পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়, এবং এ সবটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের দ্বারা অভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের জন্য বিশেষ মন্ত্রণালয়ের ছত্রছায়া শুধু স্থানীয় সরকার পরিষদকে প্রদান করা, তাকে ভিন্ন চরিত্র দানেরই শামিল, যা একা স্থানীয় সরকার পরিসদের প্রাপ্য নয়। সাংগঠনিক ভাবে ইহা স্থানীয় শাসন মন্ত্রণালয়েরই অধীন। যদি জিলা পরিষদের মর্যাদা আরো অধিক হয়ে থাকে, বা অধিক করার ইচ্ছা সরকারের থাকে, তখন ইহার চরিত্র সে অনুযায়ী সাংগঠনিক হওয়া আবশ্যক।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আরেক গুরুত্বপুর্ণ ভুল হলো, তার সার্বিক নির্বাচনী বিধি নিধান। তাতে চেয়ারম্যান সহ প্রতিজন সাধারণ সদস্য পদ প্রার্থীর, গোটা জেলা বাসী ভোটারদের কাছে নির্বাচন প্রার্থী হওয়া আবশ্যিক, যা সার্বিক নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী চেয়ারম্যান পদ প্রার্থীর ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও, সদস্যদের জন্য অপরিহার্য্য নয়। তাদের জন্য তিরিশটি নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণই যথেষ্ট।

এই নির্বাচন বিধির সর্বাধিক প্রতিকুল ব্যবস্থা হলো, পদত্যাগ ছাড়া, নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্যদের, অপর কোন প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, বা নির্বাচিত হওয়া বৈধ নয়। এবং তারা সরকারের লাভজনক পদে আসিন হওয়া থেকেও অব্যাহতি পান নি , যে তালিকায়, রাষ্ট্রপতি থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পর্যন্ত জন প্রতিনিধিগণ অর্ন্তভূক্ত আছেন। জন প্রতিনিধি আইনের বাধা নিষেধ এই ক্ষেত্রে সংশোধিত হয় নি । সুতরাং এব দ্বারা জাতীয় নির্বাচন ও দারুনভাবে প্রভাবিত। এই বাধা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। তিন পার্বত্য জেলার জন্য স্থানীয়

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থা সম্বলিত প্রতিনিধিত্বমুলক তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠা, নিঃসন্দেহে স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্ত শাসন কামনা পুরণের পক্ষে বিরাট অগ্রগতি। ব্যবস্থাটি এতদাঞ্চলের জন্য সফল ও কল্যাণকর প্রমানিত হলে, ইহা দেশের অপরাপর অঞ্চলের পক্ষে, অনুরূপ স্বশাসন ক্ষমতা লাভের এক উৎসাহ জনক উদাহরণ হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে অভিনব এই ব্যবস্থাটির মাঝে কিছু দোষ ত্রুটি থাক। সম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের নিরিখে ঐ দোষ ত্রুটি গুলির সাংশোধন, এবং গোটা ব্যবস্থাটিকে ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনও আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাটির ভিতরকার গলদ নির্দেশ করা ও তার প্রতিকারের সোপারিশ উপস্থাপন বাঞ্ছিত বিষয়। সহজ সুফল ভোগীদের বিচারে একাজটি অপ্রিয় হলেও ইহা সম্পাদন জরুরী।

রাজনীতি বা রাষ্ট বিজ্ঞাণের বিভাজন অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সরকার এককেন্দ্রিক, যুক্ত রাষ্ট্রীয় ও মিশ্র গঠন ভিত্তিক হতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মৌলিক আইন সংবিধানই ঐ রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে। পরবর্তীকালে ঐ কাঠামো ও চরিত্রে, জনগণও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করাও যায়। কিন্তু সংবিধানের সংশোধন ও সংযোজন যথেচ্ছভাবে করা কঠিন। ব্যবস্থাটির পক্ষে সংসদীয় ও জাতীয় সমর্থন থাকা আবশ্যিক হয়।

বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবেই বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ইহাতে স্বশাসিত বা স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ রাজ্য বা অঞ্জলের অস্তিত্ব অস্বীকৃত। মুল সাংবিধানিক আইনে সংস্থান না তাকায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিবেচিত হয় নি । অঞ্চল বিশেষকে স্বায়ত্ত শাসন দান ও তজ্জন্য গোটা জাতির সম্মতি আদায় অত্যন্ত কঠিন কাজ। তদুপরি তাতে গোটা দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের ঝুঁকি ও সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জটিলতা নিহিত। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় আর জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় কাজটি মোটেও সহজ নয়। রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি দীর্ঘ সংগ্রাম, সাধনা ও আন্দোলন সাপেক্ষ বিষয়। এতে খন্ডিতভাবে হুট করে সাফল্য লাভ অসম্ভব। এই রাজনৈতিক জটিলতার আশংকায় রাষ্ট্রের কাঠামো গত পরিবর্তনের সাহস করা সম্ভব নয়। তবু বিদ্রোহ আর সন্ত্রাস দমন চুড়ান্ত আকাংখিত হওয়ায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সাংবিধানিক বাধা নিষেধ মুক্ত ভিন্ন ধরণের স্বশাশন ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরী বিবেচিত হয়েছে। ঐ চিন্তা চেতনারই ফল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। সংবিধানিক বাধা নিষেধ কাটাবার লক্ষ্যে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের নামে সংসদীয় আইনের সমর্থনেই, নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়েছে। জমি বন্দোবস্তি ও নিয়ন্ত্রণ সহ ২২টি সুনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

বিষয় ঐ পরিষদ গুলির এখতিয়ারে ন্যস্ত। ধারণা করা হয়, এই আঞ্চলিক স্বশাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিপূরক ও বিকল্প। ইহা স্বনামে প্রদেশ বা রাজ্য না হওয়ায় তা আপাতঃ এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার পরিপন্থী বিবেচিত নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদ ভিত্তিক স্বশাসন ব্যবস্থা, উহার পৃষ্ঠ পোষকদের ধারণা অনুযায়ী সাংবিধানিক বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত। এই দাবীটির সাথে আইনের প্রশ্ন জড়িত। এর বিপরীত সম্ভাবনাকে এক তরফা ভাবে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রশ্নে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ সংবিধান বিপরীত মতেরই সমর্থক।

শাসন বিচার ও আইনের সার্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষই সরকার। এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বে সর্বা। তাতে কোন অধঃস্তন আঞ্চলিক সরকার প্রয়োজ্য নয়। কিন্তু যুক্ত রাষ্ট্রীয় ও মিশ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার গুলি প্রদেশ, রাজ্য ও স্বশাসিত বিশেষ অঞ্চলের নাম ধারণ করে থাকে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ বিশুদ্ধ এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ইহাতে অধঃস্তন আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তণে মৌলিক আইন গত বাধা বিদ্যমান। এই অনিবার্য্য বাধা নিষেধের কারণে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ কোন অঞ্চরেরই আধঃস্তন সরকারী চরিত্র লাভের আইন গত সুযোগ নেই। তবু এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তন অপ্রতিরোধ্য হলে, পুণরায় রাষ্ট্র কাঠামোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা মিশ্ররাষ্ট্রীয় করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সংবিধান সংশোধনের ও আবশ্যক হবে।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া, কোন ধরণের আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও এককেন্দ্রিক সাংবিধানিক আইনের পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অধঃস্তন আঞ্চলিক সরকারের চরিত্র সম্পন্ন, তাই তার উপর ও সাংবিধানিক বাঁধা নিষেধ প্রয়োজ্য। সরকারী চরিত্র সম্পন্ন হওয়ায় তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের বৈধতা প্রশ্নাতীত ভাবার অবকাশ নেই। স্থানীয় সরকার গুলি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দ্বারা নির্দিষ্ট তিন সরকারী চরিত্রের মাঝে, সরাপরি দুটির অধিকারী। অবশিষ্ট বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাটি ও আংশিক এবং হস্তান্তরযোগ্য। সুতরাং সরকারী ক্ষমতা সম্পন্ন এই সংস্থাগুলি আঞ্চলিক সরকার ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্র কিছু নয়। এই আঞ্চলিক স্থানীয় সরকার গুলিকে আইনের বৈধতা প্রদানের প্রয়োজনে যে বিধানাবলী সংযোজিত হয়েছে, তা এই সরকার গুলির আভ্যন্তরিন বিধি বিধান মাত্র, জন্ম সূত্রের ভিত্তি নয়। উক্ত বিধিবিধানসমূহ সংবিধানের সংশোধনী ও নয়। সুতরাং আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থার উপর আরোপিত সাংবিধানিক বাধা নিষেধ কোনভাবেই তদ্বারা শিথিল বা প্রত্যাহৃত হয় নি। এক কেন্দ্রিক সাংবিধানিক

www.pathagar.com

আইন ও বিকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার পরিষদ চরিত্রগতভাবেই পরস্পর বিরোধী। এই বিপরীত ধারা এক সাথে প্রয়োগ যোগ্য নয়। মিশ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া, এই বৈপরিত্বে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। এখানে ও সাংবিধানিক বাধা বিদ্যমান।

সমর্থন সূচক পৃথক সংসদীয় আইন, ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট জিলা পরিচিতি এবং প্রদেশ বা রাজ্য আখ্যায়িত না হওয়া, পার্বত্য জিলা পরিষদগুলির অধঃস্তন আঞ্চলিক সরকার না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নয়। স্থানীয় সরকার গুলি চরিত্রে প্রকৃতই আঞ্চলিক সরকার। এ কারণে এগুলি সাংবিধানিক বাঁধায় আবদ্ধ। সংযোজিত সংসদীয় আইনের বলে, স্থানীয় সরকার গুলির আভ্যন্তরিণ কার্যক্রম ও তৎপরতা বিধিসঙ্গত হলেও এগুলির জন্ম প্রক্রিয়া ও অস্তিত্ব সংবিধানে সমর্থিত হয় নাই। ব্যবস্থাটির পক্ষে সাংবিধনিক সংস্থান গড়ে তোলা আবশ্যক। এই মূল্যায়ণে ও বটে, সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন অপরিহার্য। শুধু প্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক বাধা প্রযোজ্য নয়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটিও তদ্বারা বাধাগ্রস্ত। প্রয়োজনে এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো অথবা স্থানীয় সরকার, এর যে কোন একটি গ্রহনীয়। মিশ্র ধারার সংস্থান প্রচলিত আইননুগ ব্যবস্থায় সমর্থিতনয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুতর পদ্ধতিগত ভুল হলো, উহাতে জবাব দেহিতা ও কেন্দ্রের সাথে ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। ফলে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির উপর আমলা তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অবিার্য্য যা তার প্রতিনিধিত্বশীল উচ্চ সর্বাদার সাথে সঙ্গতিশীল নয়। স্থানীয় সরকারগুলির, আমলা নিয়ন্ত্রিত অধঃস্তন সংস্থার পরিচয় থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত উপায় হলো আনুষ্ঠাননিকভাবে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য আরোপ। নির্বাচিত বা নিযুক্ত একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বা পলিটিকেল এজেন্টের আনুষ্ঠানিক প্রাধান্যে আঞ্চলিক সরকার নিয়ন্ত্রিত না হলে সম্ভাব্য বিদ্রোহ ও স্বেচ্ছা চারিতায়, তাৎক্ষনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ সম্ভব হবে না। উক্ত ব্যবস্থাই জবাব দেহিতা ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা নিশ্চিত করবে। উহা উচ্চ সরকারী মর্যাদার প্রতীক ও বটে। এই ব্যবস্থায়, আঞ্চলিক কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও বৈধতার ছত্রছায়া আনুষ্ঠানিক হবে। সরকারী কর্মকান্ডকে নিয়মতান্ত্রিক, বৈধ ও মর্যাদা সম্পন্ন করার উহাই উপায়। এই ব্যবস্থার অভাবে স্থানীয় সরকার গুলি চরিত্রগত ভাবে হয়ে পড়েছে স্বেচ্ছাচারী অথবা আমলাতন্ত্রের তাবেদার। ইহাঅবাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

মুল্যায়ন ভিত্তিক উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমানিত হয় যে, তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলি কার্যতঃ তিন ক্ষুদে আঞ্চলিক সরকার, যা এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার অনুকুল সংগঠন নয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমর্থণে সাংবিধানিক সংস্থান বা থাকায়, তার রক্ষামূলক বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এই সাংবিধানিক সংস্থানের অভাবে ব্যবস্থাটির বৈধতাঅনিশ্চিত।

জবাব-দেহিতা ও কেন্দ্রের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কোন বিধি বিধান স্থানীয় সরকার পরিবদ আইনে সংযোজিত না হওয়ায়, উহা স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন চরিত্র সম্পন্ন সংস্থা, অথবা আমলা নিয়ন্ত্রিত তাবেদার সংগঠন। উহার প্রতিনিধিত্ব মুলক উচ্চ মর্যাদা ও কেন্দ্রীয় সংযোগ এই ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক নয়।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনটি, মুল সাংবিধানিক এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সংশোধনী বা পরিপুরকও নয়। আইনটি পরিষদের আভ্যন্তরিন বিধি বিধান মাত্র। সুতরাং পরিষদ গুলির জন্ম ও স্বংস্থান সাংবিধানিক ভাবে বাঁধাগ্রস্ত আছে। গঠিত হলে ও এ গুলির আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ যোগ্য।

এই প্রশ্ন ও সমস্যা গুলির সাংবিধানিক প্রতিকারই আবশ্যক। নতুবা আইনগত চ্যালেঞ্জের মুখে, স্থাপিত পরিষদ গুলির অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখা দায় হবে। বেআইনী ঘোষিত হওয়ার আগে, এ গুলির সাংবিধনিক সংস্থান প্রয়োজন। যে কঠিন ও জটিল সংশোধনীর ভয়ে প্রদেশ গঠন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তা-ই এখন পরিষদ গুলির বেলায় অনিবার্য্য। হয় নতুন বিধি সংযোজন বা সংবিধানের প্রতিকুল ধারার প্রত্যাহার বা সংশোধনের দ্বারা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে আইনগত সংস্থান করে নিতে হবে, নতুবা উহার বৈধতা ক্ষুন্ন হওয়া অপরিহার্য্য। কোন তৃতীয় সমাধানের পথ এ ক্ষেত্রে আছে বলে মনে হয় না।

(জুলাই ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

উপজাতীয় অধিকারের বিতর্ক

বিষয়টির ধারণাগত বিশ্লেষণ আগে দেওয়া দরকার। উপজাতীয় লোকজন বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সোচ্চার। দেশে বিদেশে বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। উপজতীয় পক্ষের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হলো, এতদাঞ্চল তাদের নিজস্ব এলাকা। বাঙ্গালীরা এখানে বহিরাগত। তাই বাঙ্গালীদের আগমন, বসবাস ও পুনর্বাসন গ্রহণ বেআইনী। সম্প্রতি মানবতাবাদী একটি ইউরোপীয় গোষ্ঠি, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ও ত্রিপুরায় তাদের তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে "লাইফ ইজ নট আওয়ার্স" নামে একটি প্রতিবেদনমুলক পুস্তক ছেপে, উপজাতীয় দাবীর পক্ষাবলম্বন করে, আন্তর্জাতিকভাবে ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। দেশেও সাধারণ লোক থেকে গুণী জ্ঞানী পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি আছে। সবই ভুল তথ্য আর তথ্য হীনতায় আচ্ছন্ন। প্রকৃত তথ্য দুষ্প্রাপ্য নয়। তবু উহা খুঁজে দেখার প্রয়াস নেই। সস্তা বুলিতে সবাই বিভ্রান্ত। বিতর্কটি অনভিপ্রেত। সহজভাবে এই জটিলতা কাটিয়ে উঠার উপায় নেই। বিষয়টি ধারণাজাত, তাই এর প্রকৃত সমাধান অন্য কিছুতেও নেই। অস্ত্র, জোর জবরদস্তি, কঠোরতার প্রয়োগ, এখানে যথার্থ নয়। মানুষের মন মস্তিষ্ক ও ধারণাকে তজ্জন্য সহায়ক তথ্য যোগাতে হবে। এই ক্ষেত্রে তথ্য হীনতা ও ভুল তথ্যই মারাত্মক। উপজাতীয় পক্ষের হাতে এতদাঞ্চলে তাদের আদি বাস সম্বন্ধে শ্রুতিকথা ও কিংবদন্তি ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাদের কিংবন্তিমুলক কাহিনী ও দাবীকে অবিশ্বাস্য বলে প্রত্যাখ্যান করা হলে, তাকে অসঙ্গত বলাও যাবেনা। এর বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ কম হলেও খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলা হয়ঃ উপ-জাতীয় দাবীগুলি ভুল ধারণাজাত ও হিংসা প্রসুত এবং তাতে গ্রহণীয় যুক্তি নেই, তাহলে তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। মনে হয় উপজাতীয় মহল যুক্তির চেয়ে হিংসার দ্বারাই অধিক প্রভাবান্বিত। তাদের মাঝে উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিতদের অভাব নেই। খুঁজে দেখলে পাওয়া সম্ভব যে এতদাঞ্চলের মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে বহু মুল্যবান ও তথ্যবহুল পুস্তকাদি লিখিত হয়েছে। সে সব লেখকগণ আন্তর্জাতিকভবে নির্ভরযোগ্য পন্ডিত বলে স্বীকৃত, এবং ঐ পুস্তকগুলি ইতিহাস ও নৃতত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাবে সুখ্যাত। ঐ লেখক ও পুস্তিকাগুলির অবদানের অনেকাংশ এই পর্বতাঞ্চল নিয়েই রচিত। সেই বিদেশী পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান, প্রত্ন নিদর্শন, ও পুরাকীতি সমূহের মাধ্যমে যে বাস্তব

www.pathagar.com

অতীত-চিত্র ফুটে উঠে, তা একাধারে নির্ভর যোগ্য ও নিরপেক্ষ। সে সব বর্ণনাকে অবলম্বন করে উপজাতীয় দাবিগুলি রচিত হলে আপত্তির কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ হয় আজগৌবী কথা কহিনীকে প্রাধান্য দেওয়ায়। তাই বলতে ইচ্ছে হয়ঃ উপজাতীয় মহলের ইতিহাসমূলক বক্তব্যের মুল অত্যন্ত কাঁচা। তাদের এ দেশীয় জাতীয়তা নিশ্চিত নয়। সব দাবীদাওয়ার আগে প্রথমেই প্রমান করতে হবে যে তারা এদেশের আদি বাসিন্দা ও বিশুদ্ধ ভূমিজ সন্তান। দক্ষিণপুর্ব এশীয় ভাষা সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য ধারণ করে অধিকাংশ উপজাতি এখনও বিদেশী পরিচয় ধারণ করে আছেন। শত বৎসরের জন্মমৃত্যু আর বসবাসেও তারা অবাংলাদেশী। তাতেই প্রমানিত হয় তাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশে নয় বিদেশে অবস্থিত। মন মানসিকতা ধ্যানে ও জ্ঞানে এখনও তাদের মাঝে বিজাতীয় যোগসূত্র অক্ষুন্ন আছে। কথায় কাজে মননে জন্ম সূত্রে তাদের ভিন্নতা, ও দক্ষিণপুর্ব এশীয় পরিচিতি অম্লান ও পরিষ্কার। তাদের এদেশীয় পরিচয় আর আনুগত্য প্রশ্নাতীত হলে, তারা আমাদের স্বদেশবাসী, ইহা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য হতো। যাদের ব্যাপারে আমরা অধিক আগ্রহান্বিত, সেই চাকমা সম্প্রদায়কে নিয়েই গোল বেঁধেছে অধিক।

আমাদের ধারণা ছিলোঃ যেহেতু তারা ইতিহাস ঐতিহ্যে আত্মীয়তায় আচার অভ্যাসেও ধর্মে কর্মে অদিকাংশে ভারত উপমহাদেশীয় চরিত্র সম্পন্ন, সুতরাং তারা চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও অধিকহারে এ দেশীয় ভূমিজ সন্তানদের সাথে একাত্ম হবেন। আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলা, আর বাঙ্গালীদের পোষাকী চরিত্রে আগাগোড়া সজ্জিত হওয়া সত্বেও, তাদের বাঙ্গালী হওয়ার প্রতি অস্বীকৃতি, একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। এই ধারণাগত পার্থক্য বাঙ্গলীতে ও চাকমাতে মৌলিক তফাৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা তাদেরকে একাত্ম ভাবলেও তাতে তারা অস্বীকৃত। অধিকন্তু তারা অন্যান্য উপজাতিদের থেকেও পৃথক এক সম্প্রদায়। মানসিক কারণে তারা যেমন বাঙ্গালী হতে অস্বীকৃত, তেমনি ভাষাগত কারণে প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতি সমাজ থেকেও ভিন্ন। দেশ ও জাতির প্রতি এ কারণেই তাদের একাত্মতা ও আনুগত্য সন্দেহাতীত ভাবা হয় না। তাদের আচরণে বাঙ্গালী, আর উপজাতি সহ অবশিষ্ট দেশবাসী সন্দিহান। এ সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছে, তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র প্রচেষ্ঠা। এ পরিস্থিতিতে অতীত ইতিহাস তুলে ধরা এজন্য দরকার যে তাতে তাদের হুশ ফিরে আসতে সহায়তা হবে। এ কথা জানিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক যে, চাক্মারা মুলতঃ আরাকান থেকে আগত বিদেশী। তাদের জাতীয়তা ও মানসিকতা এখনও বিতর্কিত। তাদের জন সংখ্যার অদিকাংশ বার্মা আরাকানের পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে, তথাকার বাস্তুচ্যুতদের এদশীয় বংশধর। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের

www.pathagar.com

ধরে রাখলেও এদেশে তাদের বসবাস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যে জনগণ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করার পরেই এই বিদেশী শরণার্থীদের বংশধরেরা এ দেশের আইন সঙ্গত নাগরিকে পরিণত হবে। এখন তাদের প্রধান আন্দোলনের বিষয় হলো মূলতঃ এদেশীয় নাগরিকত্ব ও জাতিত্বে উত্তরণ–স্বায়ত্তশাসন বা বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা নয়। প্রমান ভিত্তিক ইতিহাসের বিবরণে, একমাত্র ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মুণ্ড শিকারী কুকি আর মগ সমাজই প্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে আগমন নির্গমন ও বসবাসের ঘটনার সাথে জড়িত পাওয়া যায়। আর কোন উপজাতীয় লোকের এতদাঞ্চলের প্রাচীণ অধিবাসী হওয়া সমর্থিত নয়। অন্যান্য উপজাতিদের এতদাঞ্চলে আগমন নির্গমন ও বসবাস সর্বাধিক বৃটিশ আমলেরঘটনা।

তবে বহিরাগত উপজাতিদের মাঝে চাকমাদের কিছু লোকের আগমনকাল মোগল আমলের শেষ সময় বলেই নির্ণীত হয়। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম ও পূর্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে মগ কুকি ও ত্রিপুরাদের রাজনৈতিক আগমণ নির্গমণ ঘটেছে ও দখল সম্প্রসারিত হয়েছে। তবু তাদের খুব কম লোকই এতদাঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসন গ্রহণ করে। এখানে কৃষি কাজে ভূমি ব্যবহারকারী স্থায়ী ও প্রধান অধিবাসী হওয়ার গৌরব একমাত্র বাঙ্গালীদেরই প্রাপ্য। যদিও তখন লোক বসতি ছিলো বিরল, এবং অধিকাংশ পাহাড়াঞ্চল ছিলো অনাবাদী। কুকি মগ ও ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য উপজাতিদের নাম পরিচয় আর অস্তিত্বের কথা সর্বাধিক বৃটিশ আমলেই গোচরীভূত হয়। ঐ আমলের শুরুতে দূরবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী বিভিন্ন উপ–জাতীয় লোকের এতদাঞ্চলে আগমন আক্রমণ ও তজ্জন্য অরাজকতা ঘটে। বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেও বটে, বহিরাগমণ ব্যাপক ও তরান্বিত হয়। এসব ঘটনার বিবরণ সেকালের সরকারী রেকর্ডপত্রে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এবং তা নিয়ে অনেক মুল্যবান ঐতিহাসিক বই পুস্তক ও রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ পণ্ডিত জোয়াও ডে বারোজের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অংকিত প্রাচীন বাংলার একটি মানচিত্রই সর্বাধিক প্রাচীন দলিল, যা চাকমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম তথ্য দান করে। অন্যান্য প্রাচীন তথ্যগুলি উপজাতীয় কিংবদন্তি থেকে গৃহীত, সুতরাং তা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তৎপর আমরা অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণা নিবন্ধ "অরির্জিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস" থেকে অবগত হইঃ জনৈক শেরমস্ত খাঁ–ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তদীয় অনুসারী কিছু চাকমা সহ আরাকান ত্যাগ করে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে মোগুলদের

www.pathagar.com

অধীন চট্টগ্রামের কোদালা অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে ১৭১১ খ্রীঃসালে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতীয় রাজা হিসাবে জনৈক চন্দন খাঁ আবির্ভূত হোন, যার বংশধরদের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ ১৭২৪ খ্রীঃ সালে অবাধ্যতার কারণে মোগল শক্তি কর্তৃক আরাকানে বিতাড়িত হোন। রতন খাঁর বংশ ও তাদের উপজাতীয় অনুসারীদের পরিচয় পরিষ্কার নয়। তাদের সাথে চাকমা ও শেরমস্ত খাঁ বংশের সম্পর্ক থাকা অনিশ্চিত। উভয়ের আগমন ও নির্গমণকালের মাঝ খানে তের বৎসরের এক ব্যবধান বিদ্যমান। মার্মা আর মগেরা নামেই বর্মী পরিচিত। ত্রিপুরা ও লুসাই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্য ও আসাম থেকে আগত। চাকমাদের রাজা শের জব্বার খানের সীল মোহরেই প্রমান, তারা বৃটিশ পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দির একটি লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শেরমস্ত খাঁ। একটি চাকমা ছড়া গানেও এভাবে তাদের আদিবাস বিবৃত হয়েছে।

যথাঃ

"আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ
রোয়াং ছিল বাড়ী
তার পর শুকদের রায়
বান্ধেজমিদারী।"

সুতরাং ইহা নিঃ সন্দেহ যে উপজাতিদের আদি বসবাস ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় তারা এতদাঞ্চলে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর। তাদের নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী হওয়া মঞ্জুর সাপেক্ষ। তারা বাঙ্গালী নয়, বাংলাদেশীও নয়, মুলতঃ অস্থানীয় আর বিদেশী বংশোদ্ভুত।

আরাকানবাসী মগ ও চাকমাদের বিপুল সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ ও চট্টগ্রাম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় ও প্রধান ঘটনার কাল হলো প্রাথমিক বৃটিশ আমল, যার বিশদ ও নিরপেক্ষ বিবরণ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লেখনীতেই পঠনীয়, যিনি এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় একজন প্রধান পণ্ডিত যথাঃ

A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hill undoubtedly came about two generations ago from Aracan. This is asurted both by their own

www.pathagar.com

traditions and by recors in the chittagong collectorate. It was in some measure due to the erodus of our hill tribes from Arracan that the Burmese War of 1824 took place which ended in the annexation to British territory of the fertile Proviuce of Arracan. As this is a point interesting not only from its local bearing on the hill tribes but also in a larger and more important historical sense, I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorities and the Burmese, which eventually culminated in war hinged in a great measure upon refugees from the hill tribes who fleeing from Arracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese.

Among the earliest records that we have of our dealings with the Burmese, are two letters, written, one by the King of Burmah, the other by the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong and received about the 24th June 1787.

(Ref: THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN Page 28/29)

বাংলাঃ "উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে তাদের অধিকাংশই প্রায় দু'পুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। ইহা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমানিত, যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয় লোক জনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদ্দরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মীযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। উহা বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপ-জাতিগুলির কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণেও হৃদয় গ্রাহী। আমি এখানে সেসব ব্যাপারগুলি চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো; পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ, ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উথাপন করেন।

www.pathagar.com

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাদিক প্রাচীন দলিল হলো দু'টি চিঠি যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিত হয়, যা সম্ভবতঃ ২৪শে জুন ১৭৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্রঃ দি হিল্‌ট্রাক্টস্ অফ চিটাগাং এণ্ড ডুয়েলার্স দেয়ার ইন, পৃঃ ২৮/২৯)। মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠি খানার পরিপুর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেনঃ

This letter is explicit enough. the fugitives referred to are evidently men of the Chuckma and Mrung hill tribes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Arracan. The persons in question were probably the chiefs of the clans, and the driving of them from British territory would have been equivalent to the expulsion of the whole clan.

বাংলাঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকগণ প্রমানিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরং সম্প্রদায়ের লোক যারা এখনো তাদের পুর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃতিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাদের সমাজপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ। এবার আরাকানের রাজায় প্রদত্ত চিঠিখানা প্রনিধান যোগ্য যথাঃ

"From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our teritiries are composed of five hundred and sixty countries and we have ever been on terms of friendship and the inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to each of us. A person named keoty having absconded from our country took refuge in yours. I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that Keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possessins refused to sent him to me. I also am possessed of extensive country and keoty in consequence of his

www.pathagar.com

desobedient conduct and the strength and influnce of my king's good forutne was destroyed.

"Domcan Chukma, and Kiecopa lies Marring and other inhavitants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishmen at the mouth of the Naf, and stole away everything he had with him. Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them, beacause they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robbers. It is not proper that you should give asylum to them or the other Mughs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your country and give them up, I shall be under the necesity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mahommed Wassene. Upon the receipt of it, either drive the Mughs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately." (Page: 29)

বাংলাঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যেঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের দেশ সমুহের অধিবাসীগণ স্বেচ্ছায় আর অবাধে পরস্পরের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে খুঁজে পেতে নিযুক্ত নই, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছিলাম, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার

www.pathagar.com

হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। ইহা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে, আমার রাজার প্রতি অবাধ্য; এবং দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকবে এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান ও ধরে হস্তান্তর না করেন তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানেই তারা থাকুক না কেন, একদল সৈন্য নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। ইহা বুঝে পেয়ে হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, অথবা তাদেরকে আশ্রয় দিবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র পত্যুত্তর দিবেন।" (সূত্রঃ ঐ পৃঃ২৯)

মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথাঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost imediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of June, writes to the Governnor General in Council, reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance until this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugees should

www.pathagar.com

be driven out of British territory. He adds, also that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports, further, that a Chakma Sirdar, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundering. Ten years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31st May, from the Chief of Chittagong to the Honble Warren Hasting. Governor General that some thousands of hill men had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and Macfarlane's History of British India. page 355, records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius tortures."

In 1809 Macfarlane records that disputes coutinued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but the organized forays into that territory hardly assumed any narrative definite form until 1823 (Wilson's of the Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, therefore, of all these desterbence. Rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtadly the emigration to our hills of tribes hitherto subject to their authority.

www.pathagar.com

The origin of the tribes is a doublful point. pemberton ascribes to them a Malay descent. Colonel Sir A. Phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of Myamma or Burmeses extraction. Among the tribes themselves no record exists, save that of oral tradition, as to their origin. The Khyoungtha alone are possessed of a written language; they have among them several copies of the Raja Wong, or History of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The Tongtha, on the other hand possess no written character, and the languages spoken by them are simple to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and past history is therefore natarally meagre and unreliable (Page 32/33).

বাংলাঃ "এই চিঠিগুলি লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় পাওয়া গিয়েছিলো। এগুলি পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবেদনে ইহা লিখে পাঠান যে, তাকে মীমাংসা ও সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবার সুযোগই দেওযা হয় নি। যদ্ধরুন আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে ইহাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু সমতল ভূমিতে শান্তিপূর্ণ চাষাবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতিমধ্যে পাহাড়ে ও বনে অস্থায়ী আবাস পড়ে নিয়েছে এবং যাযাবর জীবন যাপন শুরু করে দিয়েছে। ইহার

www.pathagar.com

দশ বৎসর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১ শে মে তারিখের আরেকটি চিঠি যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন দানের আশ্বাসে উদ্বীপ্ত। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল। মেক ফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক "বৃটিশ ইন্ডিয়া'র ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৯৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারদের বা যাদেরকে তারা ডাকাত বলে খুঁজে ধরে নিতে বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে হানা দেয়। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়, তাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেক ফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত সংঘর্ষ কমই সফলকাম হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত 'নেগ্রেটিভ অফ বার্মিজ ওয়ার' পৃষ্ঠা ২৫)।

ঐসময় সংঘটিত ঘটনাবলী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য্য করে তুলে। দেখা যায় এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণ ধার্য্য করে। নিঃসন্দেহে যে কারণটি হলোঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ করে, আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্ণেল স্যার এ, কেয়রী অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়ান্মা বা বর্মী লোকদ্ভুতই হবে। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত, মূল জন্ম বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংখাঁ পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক 'রাজাওং' বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়।

কিন্তু আমি তাদের পর্বতবাসের জীবন বৃত্তান্তের উপর কোন তথ্যই অবগত হতে পারি নি। অপর পক্ষে 'টংথা' নামীয়রা কোনরূপ লেখশৈলির অধিকারী নয়।

www.pathagar.com

তাদের কথাবার্তা হলো কোনমতে চাহিদাকে ব্যক্ত করা, যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তির তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য।" (সূত্রঃ ঐ পৃঃ ৩২/৩৩)

মিঃ লুইন ও কর্ণেল ফেয়রী আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত পূরাতাত্ত্বিক। তারা নিজেদের কর্মজীবনের দীর্ঘকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে সরকারী দায়িত্ব পালনে ও তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। তাদের বর্ণনাগুলিকে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ভাবা হয়ে থাকে। গত শতাধিক বৎসরেও তাদের বর্ণনাগুলি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা অসত্য প্রমাণিত হয় নি। খোদ উপজাতীয় পণ্ডিতদের অনেককে তাদের বর্ণনার সূত্র ধরেই নিজেদের অতীত অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসী উপজাতিদের অধিকাংশ আরাকানী শরণার্থীদের বংশোদ্ভূত, এদেশের আদি অধিবাসী নয়; এবং তাই তাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী হওয়া বিতর্কিত। উপজাতি সমূহের আগমণ নির্গমন ও বসবাসের মৌলিক তথ্য তাদের সংরক্ষিত কিছু দলির প্রমাণ নিদর্শনও চর্চিত গানের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাতেও সমর্থন মিলে যে, তাদের অধিকাংশ বার্মা ও আরাকান থেকে আগত এবং অবশিষ্টরা আসাম ও ত্রিপুরার আদি বাসী; যারা শরণার্থী ও প্রবাসী থাকা অবস্থায়, বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। তারা কয়েক পুরুষ আগেও বিদেশী আর অস্থানীয় ছিলো। সেই তাদের বংশধরগণ এযাবৎ অস্থানীয় আর বিদেশী বলে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হওয়ায়, ধারণাগতভাবে তাদের নাগরিকত্বের বিতর্ক চাপা পড়ে গেছে। তাই নূতন প্রজন্মের উপজাতি আর বাঙ্গালীরাও বটে, স্ব স্ব মৌলিকত্বকে ভুলে আছে। উপজাতি আর এতদাঞ্চলের প্রামান্য অতীত ঘটনাবলী গ্রন্থনা ও চর্চার অভাবে মারাত্মক তথ্য শুণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যদ্দরুণ জ্ঞানী গুণী, সাধারণ আর সরকারী কর্মচারীরাও বটে, এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসী নাগরিক হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ভুল মূল্যায়ণের ভিত্তিতেই উপজাতিরা বৈষম্য আর উৎপীড়ণের অভিযোগ উথাপন সহ স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সোচ্চার। অথচ অবিতর্কিত স্থায়ী নাগরিকদের পক্ষেই কেবল রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার দাবী উথাপন করা সম্ভব। প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিদের জাতীয়তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী নয়। আনুগত্যহীনতার কারণে বিহারী মুসলমানেরা বাংলাদেশে বিদেশী ঘোষিত। ঠিক অনুরূপভাবে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিরা, রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী হওয়ার কারণে, আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পাওয়ার অযোগ্য ইহা ঘোষিত হলে আপত্তি করার কিছুই থাকে না। এবার আমি সুধী পাঠক মহলকে ইংরেজ পণ্ডিত বি আর

www.pathagar.com

পার্ণের একটি গবেষণা তথ্য উপহার দিয়ে অবগত করতে চাই যে, চাকমাদের কল্পিত মইসা গীরি বা মনিজা গীরি কাহিনীটি, একটি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান। বর্ণিত তথ্যটি নিরপেক্ষ ও সরকারী গোয়েন্দা রিপোর্টের দ্বারাও সমর্থিত। মইসাগীরি ঘটনার কার্যকাল, বাংলায় বৃটিশ শাসন শুরুর অর্ধ শতাব্দীর ভিতরই নির্ণীত হয়। বি আর পার্নের বর্ণনাতে খাটি ও নির্ভূল হওয়ার সমুদয় গুন সন্নিবেষিত আছে। উহাতে প্রমানিত হয় চাকমাদের দাবীকৃত প্রাচীন জাতীয় রাজ্য মইসাগীরি আদতে আরাকান ভাগের নাফ নদীতীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট ভূভাগ যা সেখানে মুরুসুগিরি নামে অভিহিত। উহা ঐ নামের জনৈক স্থানীয় সর্দারের নিজ নামে অভিহিত ভূসম্পত্তি বটে। রাজ্য হওয়ার যোগ্য বিরাট কোন ভূভাগ তা নয়। তাদের দাবীকৃত অপর জাতীয় রাজ্য ও রাজধানী আলী কদমের বেলায় ও অনুরূপ বিভ্রান্তি বিদ্যমান। বাংলার ইতিহাসের দ্বারা ইহা অকাট্য ভাবে প্রমানিত যে, পর্তুগীজ পণ্ডিত জোয়া ও ডে বারোজের বর্ণিত কোদা ভোস কাম আসলে এতদাঞ্চলীয় হোসেন শাহী শাসন কর্তা খোদা বখশ খান এবং লোবাস ডোকাম কার্যতঃ তারই শাসিত অঞ্চল ও সদর দপ্তর আলী কদম। চাকমারা বড় জোর ঐ মুসলিম শাসক ও রাজ্যের ভক্ত প্রজা হয়ে থাকবে। তাদের অধ্যুষিত কথিত চাকোমা অঞ্চলটি বার্ম। বা আরাকান অভ্যন্তরে অবস্থিত মুসলিশ রাজ্যের অধিকৃত উপনিবেশ হওয়াই সম্ভব। চাকমা লোক কাহিনীতে ও স্বীকৃতি আছে যে, মগদের ভীষণ উৎপীড়ণে বিতাড়িত হয়ে তারা মুসলিশ শাসিত অঞ্চলে আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করে। এই সুবাদে মুসলিমরা তাদের স্বপক্ষ, এবং মুসলিশ শাসিত অঞ্চলই তাদের স্বরাজ্য হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ তাদের মাঝে তখন মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্কের শিথিল বন্ধন কার্যকরও ছিলো, যার প্রতিফলন হিসাবে মুসলিম নাম খেতাব, ভাষা ও আচার আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা থেকে তারা বর্তমান বিরূপ পরিস্থিতিতে ও মুক্ত নয়।

মিঃ বি আর পার্নের উদ্‌ঘাটিত তথ্যটি এবার প্রনিধান যোগ্য যথাঃ–

Thirteen years before, at the time of the Magh migrations of 1798, an Arakanese chief who was known to the English as "Moorusugeeree" had fled into Chittagong, followed by many adherents, for he had been popular with his people. It was he who had invited King Bodawpaya to seize the crown of Arakan; but he had quarrelled with the Burmese and had settled, with the permission of the

www.pathagar.com

Company's officers at Harbang. The English knew him as "Moorusugeeree", which they thoght was his name, whereas it is evidently the title "Myothugyi". His real name was Nga Than De. He had a son named Chin Pyan, who was called by the English "King-bering" or "King-buring". Chin Pyan's own account of his father and of himself is as follows. In 1145 Mugg the country of Araccan was overrun with plunderers. In consequence my father addressed a letter to the King of Ava who sent in army and took possession of Arracan. The King looking on my father as a person of royal blood, put him in possession of the Government of Arracan, retaining only the name of sovercign to himself. In 1160 (Mug) the said King demanded from my father a quota of 20,000 muskets and 40,000 men to make war on Siam. My father consented to furnish the half of this demand. The King was angry at not getting the whole, and seized my brother and killed him. On this account my father with his relatives and friends, and all his adherents, consisting of most of the inhabitants of that country, emigrated. My father died. We sought refuge in the English territory, and I concealed myself at Hurvung. Mr. Cox at this time came to Ramoo by order of the Gevernment and distributed food and implements for cutting the jungles to all the Mugs. They cultivated the ground and thus earned a subsistence Mr. Cox made every search for me, but through the operation of my civil destiny, he did not find me. After the death of my father, my mother took everything he possessed. I got nothing."

Chin pyan's father had apperentlay before he fled to Harbang owned an area of land near the banks of the Naaf river, which formed the boundary between Indian and

www.pathagar.com

Burmese territory. This land derived from its owner the name of "Moorusugeeree." When he fled from Arakan, Nga Than De had abandoned his property, but early in the year 1811 Chin Pyan left Harbang and took possession of it, professing to act as agent for a Mohammedan, "Saddodeen Chaudry," who had induced the Collector of Chittagong to give him documentary recognition of his ownership, although, it would appear, the Collector did not know exactly where the land was.

(Ref: goernal of Burma Resuerch society: the King Bering Page 44/48). ঠ ২৩.১১.১৯৯৩

"মগদের ১৭৯৮ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশ (আরাকান) ত্যাগের তের বৎসর আগে, একজন আরাকানী সর্দার, যিনি "মুরু সুগীরি নামে ইংরেজদের কাছে পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বহু সংখ্যক অনুসারী ও তার সঙ্গী হয়। তিনি নিজের ঐ জনগণের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। বার্মার রাজা-বোদাওপায়াকে আরাকানের সিংহাসন দখলের জন্য তিনিই আহবান করে আনেন। তবে তিনি বর্মীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, ফলে (ইষ্ট ইণ্ডিয়া) কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুমতি ক্রমে হারবাং অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপণ করেন। ইংরেজরা তাকে মুরুসুগীরি হিসাবেই জানতো, যা তার নাম বলেই তাদের ধারণা ছিলো। অথচ এ প্রমান আছে যে তাঁর উপাধি ছিলো মাইয়োযগাই ও আসল নাম ছিলো নগো থান দে। চীন পিয়াঁ নামীয় তার একজন ছেলে ছিলো। যাকে ইংরেজরা রাজা বেরিং বা বারিং নামে ডাকতো। চীন পিয়াঁর নিজের বর্ননায় তাঁর বাবা ও নিজের কাহিনী নিম্নরূপঃ

১১৪৬ মঘী সনে (১৭৮৪খ্রী)ঃ আরাকান দেশটি অরাজক লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সে পরিস্থিতিতে, আমার বাবা আভার রাজাকে একখানা চিঠিতে আহবান করেন, যিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান দখল করে নেন। রাজা আমার বাবাকে রাজরক্তের অধিকারী দেখে আরাকান সরকারের প্রাধান্য দান করেন। এবং নিজের অধিকারে শুধু সার্ব ভৌমত্বের ক্ষমতাই রাখেন। ১১৬০ মঘী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) শ্যাম দেশের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা আমার বাবার কাছে ২০,০০০ বন্দুক ও ৪০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী চেয়ে পাঠান, তাতে তিনি অর্ধেক পর্যন্ত দাবী পূরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। পরিপূর্ণ দাবী পূরণ না হওয়াতে রাজা রুষ্ট হোন ও আমার ভাইকে আটক এবং পরিশেষে হত্যা করেন। এহেতু

www.pathagar.com

বাবা নিজের সমুদয় স্বজন পরিজন ও অনুসারীদের সহ স্বদেশ ত্যাগ করেন, যারা সংখ্যায় ছিলেন, সে দেশের গরিষ্ঠ অধিবাসী। বাবা মারা যান। আমরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ ও নিজেকে হারাবার অঞ্চলে স্থাপন করি। মিঃ কক্স এ সময় সরকারের আদেশে রামুতে আসেন এবং খাদ্য বিতরণ ও মগ বসতির ভিতর জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ বাস্তবায়ন করেন। তারা জমিগুলিতে চাষাবাদ শুরু ও তাতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। মিঃ কক্স গভীর ভাবে আমার অনুসন্ধানে লিপ্ত হোন। কিন্তু আমার গোপন আস্তানার সন্ধান, ও আমার সাক্ষাৎ লাভ, তার পক্ষে সহজ ছিলো না। আমার বাবার মৃত্যুর পর, তাঁর পরিত্যক্ত সব কিছুই আমার মা নিজে হস্তগত করে নেন। আমি তার কিছুই পাই নি ।

অতঃপর মিঃ বি আর পার্ন মুরুসুগীরি অঞ্চল সম্বন্ধে নিম্নরূপ অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেন, যথাঃ "হারবাং অঞ্চলে পলায়নের আগে নাফ নদীর তীরে চীন পিয়াঁর বাবার বিশুদ্ধ মালিকানাধীন একখণ্ড ভূসম্পতি ছিলো যা-ভারত ও বার্মার মধ্যবর্তী সীমান্ত চিহ্নিত করে। এ জায়গাটি তার মালিকের পরিচয় বহন করে একই মুরুসুগীরি নামে অভিহিত হতো। তিনি যখন আরাকান ছেড়ে আসেন, তখন জায়গাটিও পরিত্যক্ত হয়। তাঁর বিকল্প নাম ছিলোঃ নগো থান দে। ১৮১১ খ্রীঃ সালের শুরুতে চীন পিয়াঁ হারবাং ত্যাগ করে, এই বলে ঐ জায়গাটির দখল নেন যে, তিনি জনৈক মুসলিম সাদুদ্দীন চৌধুরীর প্রতিনিধি, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে এ জমির মালিকানা দলিল অনুমোদনে বাধিভূত করেন। যদিও মনে হয়, ঐ রাজস্ব কর্মকর্তা, জায়গাটির অবস্থান কোথায় তা সঠিক ভাবে অবগত ছিলেন না।" (সূত্রঃ জার্নাল অব্দ বার্মা রিসার্চ সোসাইটি পৃঃ ৪৪৭-৪৮ তাং ২৩/১১/১৯৩৩ খ্রীঃ)।

তৎপর মিঃ বি তার পার্ন, বর্ণিত চীন পিয়াঁ ও তার অসংখ্য অনুসারীদের বাংলার সীমান্ত অভ্যন্তরেও আরাকানের গভীরে উপর্য্যুপরি অরাজকতা ও অভিযান পরিচালনা, ও তদ্বারা বার্মা সরকারের সাথে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি ও বিরোধের বর্ণনা প্রদান করেছেন। ইহাতে নির্ভুল ভাবে প্রমানিত হয় যে, মুরুসুগীরি তথা মইসাগীরি ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাস ক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালের কাছাকাছি সময় কালে যখন বৃটিশ শাসনের চার দশক সময় কাল প্রায় অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব ইহা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গী সাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী বংশোদ্ভুত। চাক্‌মাদের সম্পর্কে অপ্রিয় হলেও আরো দায়িত্বশীল বক্তব্য আছে, যথাঃ

www.pathagar.com

১। The Most resonable account of their origin is that they are the products of unions between the Nowab Saista Khan's solders and mog women, and that the caste or clan was formed within the last 200 years or so.

(Ref: Selection from the correspondence on the revenue administration of Chittagong Hill Tracts. Page 276)

বাংলাঃ তাদের মৌলিকত্বের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হলো, তারা নবাব শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনী ও মগ স্ত্রীলোকদের পারস্পরিক মিলনজাত প্রজন্ম। গত দুশত বৎসর বা অনুরূল সময়ের ভিতর তাদের বর্ণ ও শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে। (সূত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজেস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ পৃঃ ২৭৬)

২। The Chakma's are mongolied race, probably of Arakanies origin. Though they have inter merried largely with Bengalies. They are divided in three subtribes, Chakma, Duingnak and Tanchangya. The Duingnak broken away from the main tribe a century ago, and flied to Arakan. Of later years some have returned to cox's bazar sub-division of chittagong districts. (Ref: Provincial gazatteer of India Page 410)

বাংলাঃ চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভুত। যদি ও তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপক ভাবে আন্তঃ বিবাহে আবদ্ধ, তবু তারা নিজেদের মাঝে তিন শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা চাকমা, ডুইং নাক ও টংচঙ্গ্যা। শতাব্দীকাল আগে ডুইং নাকেরা মুল সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিলো। কয়েক বৎসর আগে তাদের কিছু লোক পুনরায় চট্টগ্রাম জিলার কক্সবাজার এলাকায় ফিরৎ এসেছে।

(সূত্র প্রভিন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডেয়া পৃঃ ৪১০)

৩। The tribes consider themselve decendents of emigrants from Bihar, who came over and settled in this parts in the days of the Arakanies kings.
(Ref: An Account of Chittagong Hill Tracts, by S, H, Hachinson Page 89)

www.pathagar.com

বাংলাঃ এই উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহারবাসীদের বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখন্ডে আরাকানি রাজাদের শাসন কালে আবাস গড়ে নিয়েছিলো। (সূত্রঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল্ট্রাক্টসঃ এস এইচ, হাচিনসনঃ পৃ-৮৯)

৪। তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বানিজ্য উপলক্ষে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের অনেকের উপাধি ছিলো শেখ যা থেকে থেক বা স্যাক নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(সূত্রঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪ পৃঃ ২০১-২ কর্ণেল ফেয়রী লিখিত প্রবন্ধ)

৫। চাকমাগণ মগনারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকেই মোগল ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনুগত হয় এবং খোদ চাকমা প্রধানরা ও মুসলমানী নাম ও খেবাব ধারণ করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠে, এবং হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

(সূত্রঃ সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ)

৬। চাকমাগণ আধাবাঙ্গালী। বস্তুতঃ তাদের পোষাক পরিচ্ছদ আর ভাষাটিও একজাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধি সহ নামগুলিও এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

সূত্রঃ (১) মিঃ জীম বীম সেন কমিশনার চট্টগ্রাম এর চিঠি নং-২২৭ এইচ/তাং ৫,৯,১৮৭৯ইং

(২) চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ১১

৭। প্রচলিত মগ জন শ্রুতিঃ কোন এক সময় চট্টগ্রামের জনৈক উজির আরাকান রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে এক শুদ্ধাচারী ফুঙ্গী, উজির সাহেবকে আহারের নিমন্ত্রণ দেন। খাবার দিতে দেরী হওয়ায় উজির সাহেব জনৈক সৈনিককে উহার কারণ অনুসন্ধানে পাঠান। সৈনিকটি ফিরে এসে তাঁকে জানায় যে, ফুঙ্গী নিজের পা চুলাতে স্থাপন করেছেন ও তা থেকে আগুন জ্বলছে। এই সংবাদে উজির সাহেব রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ইতিমধ্যে ফুঙ্গী খাদ্যাদি সহ এসে দেখেন উজির সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা নেই। তাতে তিনি মনোক্ষুন্ন হয়ে অভিশাপ দেন। পরিশেষে উজির সাহেব সসৈন্যে পরাজিত ও বন্দী হোন এবং মগ

www.pathagar.com

রাজার অনুমতিক্রমে স্থানীয় মগ মহিলাদের বিবাহ করে, সে দেশে অন্তরিণ হয়ে থাকেন। চাকমারা ঐ তাদেরই বংশধর। (সূত্রঃ চাকমা জাতি, শতীশচন্দ্র ঘোষ পৃঃ ৫)

৮। প্রবল জনরব বিদ্যমান যে চাকমা রাজা ধরম্যা বা ধারা মিয়ার সাথে কোন এক বিশিষ্ট মোগল সেনা পতির কন্যার বিবাহের সম্পর্ক ঘটে। এর ফলে চাকমা সমাজে মুসলমানী আচার ব্যবহার ইত্যাদির প্রবেশ ঘটে। মুসলমান রাণীর গর্ভজাত বলে, তদপুত্র মোগল্যা নামে পরিচিত হোন। ঐ সময় থেকেই চাকমা রাজ বংশে খাঁ ও বিবি উপাধির প্রচলণ শুরু হয়েছে। (চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ৬৪)

উপরে বর্ণিত ১, ৫, ও ৭ নং বর্ণনাগুলি চাকমাদের পক্ষে মানহানিকর বলেই আমার ধারণা। কিন্তু অদ্যাবধি তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ উত্থিত বা, তা খন্ডন করা হয় নি। বরংঃ৮ নং বর্ণনার দ্বারা তাদের মাঝে মুসলমানদের সংকব বংশধর থাকা সমর্থিত হয়।

(অক্টোবর ১৯৯১ ইং)

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট

(ক) সপক্ষের যুক্তি

১। বাংলার আদ্রি অবিচ্ছেদ অংশ চট্টগ্রামেরই এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে কোন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের কখনো সার্বভৌম অধিকার ছিলোনা। অনাবাদী দুর্গম পাহাড়াঞ্চল বলে অতীতে এখানে যেমন বাঙ্গালী বসতি ছিলো বিরল, তেমনি পাহাড়ী সম্প্রদায়গুলির অধিবাস ও ছিলো সীমিত। প্রধান দুই পাহাড়ী, সম্প্রদায় যথা চাকমা ও মারমাদের তো ইহা আদৌ স্বদেশই নয়। চাকমারা ভারতীয় বংশোদ্ভুত আরাকানী এবং মারমারা বর্মী। মারমারা তাদের যুক্তি সঙ্গত আচরণের জন্য দেশ প্রেমিক বাংলাদেশী হিসাবে স্বীকৃত। তারা এ দেশ ও জাতির অবিতর্কিত শরিক। অপরাপর ক্ষুদ্র পাহাড়ী সম্প্রদায় গুলির দেশ প্রেম ও আনুগত্যকে প্রশ্নাতীত মানা হয়। কিন্তু চাকমাদের সন্দেহজনক উগ্র রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তারা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের আধিপত্য কে চ্যালেঞ্জ করছে, এবং আন্তর্জাতিক মুরব্বীদের ছাত্রছায়া যোগাড় করে নিয়েছে। তাদের আপোষ হীন উগ্র চরিত্রের সাথে বিদেশী উস্কানী যুক্ত হয়ে, পরিস্থিতি নাজুক। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের দমান গেলে, এই পর্বতাঞ্চলে, উগ্র চাকমা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তৎপর অপরাপর ক্ষুদ্র পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা হবে বিপন্ন। এই আশংকা ঐতিহাসিক। ইহা অতীতে এতদাঞ্চলে ঘটেছে। আচার আচরণ ভাষা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তার বিচারে, পাহাড়ী সম্প্রদায় গুলির প্রত্যেকে পরস্পর থেকে ভিন্ন। অতীতে তারা পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। বৃটিশ ও বাঙ্গালীদের নিরপেক্ষ শাসন ও মধ্যস্ততার কারণে আজ তারা পরস্পরের মাথা শিকার থেকে বিরত। এখন পুনরায়/হিংসা মাথা চাড়া দিলে এবং অস্ত্র অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে, ক্ষমতার একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, পাহাড়ীদের পরস্পরের মুণ্ডপাতে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। তাই এখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে, নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

মধ্য শক্তি হিসাবে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের উপস্থিতি অপরিহার্য। বাঙ্গালীদের মুরব্বীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, সামাজিক ভাবে, বহু সাম্প্রদায়িক এ পর্বতাঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলার প্রশ্নে, ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। নতুবা সন্ত্রাসের মুখে ভীত নিরূপায় পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে নির্মূল হওয়া থেকে, বাঁচান যাবে না। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের/অবর্তমানে উদ্যত গুলি বন্দুক সাধারণ পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হওয়ার, কোন নিশ্চয়তা নেই। বাঙ্গালী নির্যাতনের কল্পিত কাহিনীতে নিশাগ্রস্ত পাহাড়ীরা শত বৎসর পিচনের ইতহাসে তাকালেই দেখতে পাবে, মগ আর চাকমাদের লড়াই, এবং কুকি ও সেন্দুজদের দ্বারা অন্যান্য পাহাড়ী অধিবাসীদের পাইকারী হত্যা। নিরপেক্ষ মধ্যশক্তি বাঙ্গালীদের অবর্তমানে, পাহাড়ীদের পরস্পরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র প্রতিযোগিতায় আবার তাদের অনেককেই জীবন দিতে হবে। সুতরাং নিরপেক্ষ মধ্যশক্তি হিসাবে বাঙ্গালীরা তাদের শত্রুনয়, মিত্র। শান্তির স্বার্থে মধ্যশক্তি বাঙ্গালীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটা উচিত। যুক্তি সঙ্গত কারণে মানতেই হবে, পাহাড়ীদের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হানাহানিতে, শক্তিশালী মধ্যশক্তি বাঙ্গালীরাই শান্তির চাবিকাঠি। সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলায়, সরকার নিজ বাহিনী গুলির দ্বারা জবরদস্তি আইন শৃঙ্খলা বজায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজ ও নেতৃবৃন্দের কাজ হলো অহিংস পথে শান্তি প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালীদের এ দায়িত্ব প্রাপ্য। সুতরাং বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নৃশংসতা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আর অদূরদর্শী।

২। হত্যার দ্বারা বাঙ্গালীদের নির্মূল করা, অথবা ত্রাসের সাহায্যে বিতাড়ণ কখনো সম্ভব নয়। সন্ত্রাসীদের এই আশাবাদ সম্পূর্ণ ভূল। মনে রাখা ভালো, হত্যা ও বিতাড়ণের দ্বারা সৃষ্ট শুণ্যস্থান শুধু পুরণই নয়, তাদের এক প্রজন্মই মাত্র, জন সংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভাসিয়ে দিবার পক্ষে যথেষ্ট। কোটি কোটি ভূমিহীন অভূক্ত বাঙ্গালীকে, দেশের এই জন বিরল অঞ্চল থেকে, মৃত্যুর ভয় ও আইনের বাধায়, বিরত রাখা অসম্ভব। সমুদ্রের বান তুফান লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিলে ও দ্বীপাঞ্চল বাঙ্গালী মুক্ত হয় নি। ভূমিহীনদের আশ্রয় লাভের অব্যাহত চাপে স্বাভাবিক ভাবেই, ইহা অচিরে বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চলে, পরিণত হবে। বিপুল প্রাণ হানি ক্ষয়ক্ষতি বিতাড়ণ আর বাঁধা-নিষেধ সত্বেও ইহা অনিবার্য। এই অনিবার্যতাকে অস্বীকার করে, পাহাড়ীদের ধ্বংসাত্মক দুষ্কর্ম অব্যাহত থাকলে, প্রতিশোধের পালা শুরু হতে পারে। এক তরফা সহ্য ধৈর্য টিকে থাকতে পারেনা। বিশেষতঃ এখানে যখন প্রতিটি বাঙ্গালীর জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে আক্রান্ত ও

www.pathagar.com

বিপন্ন। তাদের জন্য কোন একটি ক্ষেত্র ও নিরাপদ নয়। তাদের স্বাভাবিক পেশা, ব্যবসা, যাতায়াত, গৃহবাস ইত্যাদি প্রতিটি তৎপরতা বিঘ্নিত ও বাঁধাগ্রস্থ। নিরিহ শিশু-বৃদ্ধ অক্ষম অসুস্থ মুসাফির ও নারীরাও কেউ একটি মুহূর্তের জন্য নিরাপদ নয়। প্রতিটি বাঙ্গালীর জানমাল ও ইজ্জত দারুণ হুমকীর সম্মুখীন ও বিপন্ন। সর্বক্ষেত্রে তাদের যাতায়াত কর্ম প্রচেষ্টা, ঘুম ও বিশ্রাম, ভীষণভাবে বিঘ্নিত। ঘরে বাইরে পাহাড়ে জনপদে প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ তাদের জন্য অস্ত্র আর অত্যাচার ওত পেতে আছে। এই ভীষণ বিরূপ পরিস্থিতি অনির্দ্দিষ্ট কাল অব্যাহত থাকতে পারে না। লক্ষ্যণীয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচারে হত্যা অত্যাচার অনুষ্ঠানের পরে, পাহাড়ীরা সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়ে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিচ্ছিন্ন পাল্টা ঘটনায়, অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়ও হুলস্থুল শুরু করে। বাঙ্গালীদের বিপুল সংখ্যায় নির্মম অত্যাচারে হতাহত ও বিপর্যস্ত করার ঘটনাগুলি, বেমালুম চেপে রাখে। আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের অপকৌশল হিসাবে, অতিরঞ্জিত প্রচার চালায় এবং পলায়নের দ্বারা, ভূয়া অত্যাচারিত ও নিরাপরাধ শরণার্থী সাজে। খুনী অপরাধী ও তাদের সহযোগীরা, দুষ্কর্মের আইনানুগ শাস্তি এড়াতে, ভারতের আশ্রয় শিবিরকে আকড়ে থাকে। সঙ্গে নিরপরাধ শিশু কিশোর নারী বৃদ্ধকেও কষ্ট দেয়। অথচ বাংলাদেশেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল আছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ পাহাড়ী, বাড়ী-ঘর, স্কুল, কলেজ, সরকারী কার্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিঘ্নে বসবাস করছে ও তৎপরতাচালাচ্ছে।

৩। প্রকৃত পক্ষে শান্তিবাহিনী ও তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোক জনের অধিকাংশ এদেশে আশ্রিত বিদেশী। চাকমাদের আদি বাসস্থান "চম্পক নগর" বিহার বাংলা ও নেপাল সীমান্তের ত্রিভূজে, অতীতের মগধ রাজ্যের হিমালয় ঢালে অবস্থিত। একদা তারা বিতাড়ণ, পরাজয় বা নির্বাসনের দ্বারা, আরাকানে স্থানান্তর ও বসতি স্থাপন করে। সেখানে স্থানীয় অধিবাসী মগ বা মারমাদের সাথে সংঘর্ষে পরাজিত, বন্দি আর উৎখাত হয়। তাদের অনেকে বিভিন্ন সময়ে পলায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলের আরাকান সীমান্তবর্তী মাতামুহুরী নদী উপত্যকার তৈনছড়ি, আলীকদম ও বাঁকখালি অঞ্চলে উপনীত হয় এবং অংশতঃ মোগলদের দ্বারা আর অংশতঃ বৃটিশদের দ্বারা, তথায় শরণার্থীর মর্যাদায় আশ্রয় লাভ করে। আরাকানের জনৈক শাসক ঐ অপরাধ প্রবণ লোকজনদের ফিরত দেবার জন্য, চট্টগ্রামের তখনকার শাসককে চিঠিও দিয়ে ছিলেন। সরকারী দলিল-পত্র, আর চাকমাদের লোক গীতিতে, সেই অতীত ইতিহাস এখনো বিবৃত আছে; এবং তা উদ্ধার করা এখনো সম্ভব। অথচ তার উদ্ধারের অভাবে শুণ্যস্থান দখল করে আছে বানোয়াট

www.pathagar.com

কথা কাহিনী। ঐ রেকর্ডে বিবৃত আরাকানী শরণার্থীদের, তখন স্বকীয় আচার আচরণ নিয়ম শৃঙ্খলা সংস্কার ও সংস্কৃতি অনুসরণের স্বাধীনতা ছিলো। এদেশে মদ নিষিদ্ধ হলেও, অভ্যস্ত বলে তাদের তা প্রস্তুত ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিতহয় নি। কিন্তু তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত আর অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায়, সম্পূর্ণ মানবিক বিবেচনায়, জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে বন্দোবস্তি ছাড়াই, অনাবাদী পাহাড় জঙ্গলে বসবাস ও জুম চাষে বাধা দেওয়া হয় নি। বিদেশী শরণার্থীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার কারণে, মোগল আমলে ত বটেই, বৃটিশ আমলের ও অধিকাংশ সময় তারা ছিলো আইনতঃ ভূমিহীন। পরে ঐ বিপুল সংখ্যক লোকের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ জরুরী বিবেচিত হওয়ায় এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনেও বটে পারিবারিক জুম কর আরোপ, সম্প্রদায় ভিত্তিক মৌজা ও পরগণা বিভক্তি, এবং সর্দারী প্রথার প্রবর্তন করা হয়। ইহা মোটেও নাগরিকত্ব প্রদান বা ভূমি বন্দোবস্তি নয়। বস্তুতঃ অতীতে জায়গীর, তালুক, জমিদারী ভূমি পত্তন ইত্যাদির পক্ষে সব খানদানী পরিবারে, এমনকি প্রজা স্বত্বের পক্ষেও, লিখিত দলিল ও সনদ প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ী সম্প্রদায় গুলির রাজা প্রজা কারোই সেরূপ কোন উত্তরাধিকারপত্র না থাকা, তাদের বহিরাগত হওয়ার অন্যতম অকাট্য প্রমাণ। দীর্ঘদিনে ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। আমলতান্ত্রিক বিস্মৃতি ও স্বার্থে পরিচয় পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। বিবর্তিত দীর্ঘ জন্ম অবস্থানের সুবাদে নুতন প্রভাব প্রতিপত্তি, আর পরিবেশের উদ্ভব হয়। এই বিরাট ভূলের মধ্যেই, বৃটিশ আমলের শেষকাল থেকে তারা এতদাঞ্চলে জায়গা জমির সীমিত স্বত্ব লাভ করে চাকুরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ পায়, লাভ করে উচ্চ শিক্ষা ও জন প্রতিনিধিত্বের অধিকার। এভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আজ তারা বাংলার আদি সন্তান বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে বসবাসের অধিকারকেই চ্যালেঞ্জ করছে। পোষণ করছে সার্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ। আর এ কাজে সহায়ক হয়েছে অতীতে এতদাঞ্চলে বাঙ্গালী পুনর্বাসন দানে সরকারী বিরোধীতা এবং পাহাড়ীদের সংখ্যা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দানের ঘটনাবলী। আজ তাই তারা বন্দুকের ভাষায় গর্জন করে কথা বলে, বিদেশী মুরব্বীর ভয় দেখায়, এবং এই মিথ্যা অভিযোগের সাহস পায় যে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা তাদের প্রতিও তাদের নিজ স্বদেশ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ধ্বংস প্রয়াসী। অথচ বাঙ্গালীদের শান্তির প্রীতি ও সহিষ্ণুতার সাক্ষী, সারা বাংলাদেশ ব্যাপী নিরুপদ্রবে অধ্যুষিত সম সংখ্যক অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায়, এবং হিন্দু নামের কোটি সংখ্যক প্রধান সংখ্যা লঘু সমাজ। প্রতিবেশী ভারতে প্রতি বৎসর শত শত সাম্প্রদায়িক বর্ণ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক আর উপজাতীয় অশান্তির শত শত ঘটনা ও ঘটে। কিন্তু

www.pathagar.com

বাংলাদেশ এ জাতীয় অনাচার থেকে প্রায় মুক্ত। সারাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজমান। একা চাকমা সমাজের নির্যাতিত হওয়া বিস্ময়কর। তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের কেউ অনুরূপ অভিযোগে সোচ্চার নয়। কল্পিত ও ক্ষুদ্র ঘটনা ছাড়া, এমন উল্লেখযোগ্য বড় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাঙ্গালীদের দ্বারা বিনা উস্কানীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন নজির উথাপন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বাঙ্গালীরা সামাজিক ভাবে অনুরূপ দুষ্কর্মের বিরোধী। তবু অশান্তি অবিচারের ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল করতে তারা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের পক্ষে বহুবিধ বাধা বিদ্যমান, এবং খোদ পাহাড়ী সমাজও, তাদের উদারতা ও সদিচ্ছাকে আক্রমণ ও উপদ্রবের দ্বারা অকার্যকর করে রেখেছে। এমনিতে পাহাড়ী রাজনীতিকরা সাধারণ বুদ্ধিজীবী ও বন্দুকধারী, এই দুই ভাগে বিভক্ত, এবং দ্বিমুখী সাফল্য লাভে ব্যস্ত।

৪। খুনী অপরাধী ও বিদ্রোহীদের দমন এবং তদ্বারা রাষ্ট্র ও জনজীবনকে নিরাপদ করা, সরকারের আইনসিদ্ধ কর্তব্য। অব্যাহত অভিযান ও তাড়নার দ্বারা দুষ্কৃতিকারীদের ধাবমান ও ব্যতিব্যস্ত রাখা গেলে, তাদের ক্ষয় ক্ষতি বৃদ্ধি, সাহস ও শক্তি হ্রাস, এবং অভিযান শক্তির অপচয় হতো। তাতে বাংলদেশ সেনাবাহিনীর কার্যকর ও মূল্যবান গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ হতো, এবং সন্ত্রাসীরা ও জনসাধারণের উপর নিয়মিত আক্রমণের অবসর কম পেতো। বিদ্রোহ দমনে জাতি ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে, সেনা বাহিনী সদস্যদের উহা হতো এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু এই নীতি কৌশল যথাযথ পালিত হয় নি । এ যাবৎ তাদের সমাবেশ গুলো শান্তিস্থাপক ও আত্মরক্ষা মুলকই হয়েছে যা কার্যতঃ নিষ্ক্রিয়তারই সামিল। অথচ অপরাধী ও বিদ্রোহীরা ইহাকে অবহেলা করে। সাধারণ লোকের কাছে ও এই নিষ্ক্রিয় সৈন্য সমাবেশ ভীতিপ্রদ নয়। তারা এদের অপমান জনক ভাষায় সমালোচনা মুখর। সাধারণের কাছে একজন সৈনিকের এ জাতীয় কলংকিত গোবেচারার মূল্যমান ক্ষতিকর। স্বপক্ষীয়দের বিচারেও নিষ্ক্রিয় সমাবেশ হতাশা ব্যঞ্জক। এই নিষ্ক্রিয়তাকে অনেকে মনে করে শান্তি বাহিনী ও ভারতের ভয়ের/কাছে আত্মসমর্পন। আরো কদর্য অর্থে ইহাকে বাখ্যা করা যায়, যা কার্য ক্ষেত্রে মোটে ও বাঞ্ছিত নয়। যেহেতু সরকারের পক্ষে কার্যতঃ বাঙ্গালী প্রত্যাহার অপ্রীতিকর, ও বিব্রত কর, এবং এক্ষেত্রে পাহাড়ীদের সন্তুষ্টি বিধানও কাম্য, সেহেতু সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তার অর্থ হয়ঃ শান্তি বাহিনীর প্রতি ইহা বাঙ্গালী হত্যার ছাড়, তথা বাঙ্গালী তাড়াবার ইহা এক নীরব অপকৌশল, যার প্রত্যক্ষ দায় দায়িত্ব

www.pathagar.com

সরকারের উপর বর্তায়না। এই দুঃখ জনক মুল্যায়ণের সুযোগে সরকার ও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

একমাত্র বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষীয় জনশক্তি হওয়ার অপরাধেই, এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীরা পাহাড়ীদের শত্রু। যাদের সাথে পাহাড়ীদের স্বার্থের কোন সংঘাত নেই, যারা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয়, সেই নিরিহ অসহায় গরীব শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, নারী, দীন-মজুর, বেপারী, মৎসজীবী ইত্যাদিকে নির্বিচারে হত্যা, অপহরণ ও লুট করা হয়, জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয় তাদের আশ্রয় ও সহায় সম্বল। দীন মজুর বেপারী ও মৎস্য জীবীরা অস্থায়ী ভাসমান লোক। এখানকার জায়গা জমি স্বার্থ সম্পদের সাথে তারা সম্পর্কিত নয়। সাময়িক থাকে খায় রোজগার করে, সমতলে নিজ বাড়ী ঘরে পরিবার পরিজনদের দেখা শোনা ও জীবিকা যোগাতে যায় আসে। এদের সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচারের লক্ষ্য হওয়া যুক্তি যুক্ত নয়। একমাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের উপরের জাত আক্রোশই তার কারণ। ইহা নৈতিক ও যুক্তি সঙ্গত আন্দোলনের ধারা নয়, নিরেট বর্বরতা।

৫। লক্ষণে মনে হচ্ছে বাঙ্গালী নির্মূলের অভিযানে পাহাড়ী সমাজ বিশেষতঃ চাক্‌মারা তাদের বিদ্রোহী ছেলেদের, নির্বিচারে লেলিয়ে দিয়েছে। হত্যার নৃশংসতায় গোটা পার্বত্য পরিবেশ উত্তপ্ত। উস্কানী দেওয়া হচ্ছে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তথা গৃহ-যুদ্ধের। ইহাকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পাহাড়ীদের পুরাপুরি যুদ্ধ বলা যায়। এই সীমাহীন বাড়াবাড়িকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। সহ্য ধৈর্য্য চূড়ান্ত সীমায় উপনীত। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাকিদে বাঙ্গালীরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাধ্য। তাদের ধারণা মরতে একদিন হবেই তবে জাতি দেশও শান্তির স্বার্থে জেহাদে শহিদ অথবা গাজি হওয়াই উত্তম। আর কাপুরুষের মৃত্যু নয়। এই মনোভঙ্গি বিপজ্জনক। বাঙ্গালীদের এই নবতর উপলব্ধিতে খুনের বদলা খুন ও শান্তির বদলা শান্তির নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। বোধ হয় বাঙ্গালীদের মোকাবেলার এই নীতি গ্রহণ আসন্ন। এই উত্তপ্ত বিরূপ পরিস্থিতিতে যদি আর এক ফোটা বাঙ্গালী রক্ত ঝরে, যদি আর একটি বাঙ্গালী প্রাণ ও যায়, তবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ ঠেকান যাবেনা। কারো নিষেধ ও নির্যাতনে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হবে কিনা বলা যায় না। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধে এই পর্বতাঞ্চলের তিন লাখ বাঙ্গালী শহিদ হলে, সম পরিমান পাহাড়ীকেও সমান ভাগ্য বরণ করতে হবে। তখন বাঙ্গালীদের শুণ্যস্থান পূরণ

www.pathagar.com

করার লোক থাকলেও, পাহাড়ী পক্ষে বংশ রক্ষার ও কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ। কোন সুস্থ বিবেকবান লোকের অনুরূপ পরিস্থিতি কাম্য হতে পারে না। সুতরাং সময় থাকতে শান্তির দ্বারা বিপর্যয়কে ঠেকাতে হবে। হিংসার প্রতিফল গৃহযুদ্ধ ধ্বংসই ডেকে আনবে। অবাধ বাঙ্গালী হত্যা পাহাড়ীদের পক্ষে আত্মঘাতী কাজ। বাঙ্গালীদের প্রতিশোধের উস্কানী দান তাতে নিহিত। পাহাড়ীদেরই তদ্বারা অপুরণীয় ক্ষতি হবে। পাহাড়ী পক্ষে ইহার ত্বরিত উপলব্ধি মঙ্গল জনক। বাঙ্গালী হটাও আন্দোলন জোরদার করার বিপরীতে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়া সম্ভব। অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান স্বার্থে তাদের অবিলম্বে সামলে যাওয় উচিত। বাঙ্গালী হটাও আন্দোলন ও হত্যার খুশি অচিরেই তাদের জন্য দুঃখ ডেকে আনার কারণ হতে পারে। সুতরাং উল্লাস নয়, আতংকিত হওয়াই উচিত। মনে রাখা ভালঃ যে ক্ষেত্রে ব্যাপক বাঙ্গালী হত্যা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে বাছ বিচারহীন পাহাড়ী হত্যাও চিরকাল অসম্ভব হয়ে থাকবেনা। যেখানে শান্তিবাহিনীর উথাপিত আন্দোলন ও দাবীদাওয়া গোটা পাহাড়ী সমাজের স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে তাদের সশস্ত্র দুষ্কর্মের দায় দায়িত্বের নীতিগত দায় ভাগ থেকে ও পাহাড়ী সমাজ মুক্ত নয়। আন্দোলনের সুফল কুফলকে কখনো পৃথক করে ভাগ ও ভোগ করা যায় না। সুতরাং সম্ভাব্য বাঙ্গালী প্রতিশোধের মুখে, কোন পাহাড়ীর নিরপরাধ ও নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়।

৬। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ আর ধ্বংসকে ঠেকাতে হলে, অবিলম্বে বাংগালী হত্যা বন্ধ হওয়া উচিত। নতুবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হবে। বাংগালীদের এ যাবৎ কালের নীরবতাকে অক্ষমতা ভাবা ঠিক নয়। রাগ আক্রোশ আর প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের ও আছে। উস্কানী বন্ধ না হলে, তা ফেটে পড়তে দেরী হবেনা। আঘাতে আঘাতে তারা অতিষ্ঠ। কোন বিশেষ ঘটনার, দুর্বল মুহূর্তে, অবাঞ্ছিত ভাবেই তাদের বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতি মধ্যে বড় কষ্টে তাদের শামাল দেওয়া গেছে। অরাজকতার পরিস্থিতি উদ্ভব হলে, আইন-মান্যতা ও সামাজিক শৃঙ্খলার পতন ঘটবে। রক্ত লুলোপতার পরিবেশে কেউ কারো বাধা মানবেনা। বন্ধু আর পরম হিতৈষীকেও তখন রক্ষা করা অসম্ভব হবে। বাংগালী পাহাড়ী উভয় পক্ষেই সার্বিক ক্ষয় ক্ষতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক মুরব্বীদের তাতে শুধু মুখের আপত্তি, সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং বিপন্নদের বড় জোর সাময়িক আশ্রয় দানে সীমাবদ্ধ থাকাই সম্ভব। নিজেদের বিপুল আর অপুরণীয় বিপর্যয়ে,

www.pathagar.com

পাহাড়ী বিদ্রোহী পক্ষ, নিষ্ফল আফসোসই করতে বাধ্য হবে। দেরীতে হলেও উপলব্ধি করতে হবে যে, বাংগালীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানই তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ ও নিরাপদ। ভারত নিজ দেশে সংঘাত সংঘর্ষে বিব্রত। সে শ্রীলঙ্কায় তামিলদের রক্ষা ও বিদ্রোহ দমাতে সফল হয় নি। এই পার্বত্য বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করে বাংলাদেশের সাথে বৈরীতায় জড়ানো তার পক্ষে বুদ্ধি সম্মত কাজ হবে না। পাহাড়ীদের রক্ষায় এখানে সে সীমান্ত ডিংগালে, খোদ পাহাড়ীরা ত আরো বেশী প্রতিহিংসার শিকার হবেই, ভারতকে ও তার কিছু দুর্বল এলাকায় অসুবিধার ঝুকি নিতে হবে। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও তাকে সন্দেহ আর উত্যক্ত করার সুযোগ পাবে। তার সে দুর্বল স্থানগুলি হলো রেড ক্লিপ রোয়েদাদে কর্তিত মুসলিম প্রধান অঞ্চল আর তদ্বারা বেষ্টিত ও প্রভাবিত এলাকাগুলি। ভারত যত বড় আর শক্তিশালী হোক না কেন প্রতিবেশীদের সম্মিলিত কুপে পড়া, তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ক্ষুদ্র চাকমা সমস্যা তার কাছে সামান্য কূটনীতির ব্যাপার, ও তুচ্ছ।

বাঙ্গালীদের পক্ষে উপজাতিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নির্মম নিষ্ঠুর, ও জঘণ্য ঘটলাবলীকে দীর্ঘদিন সহ্য আর অবহেলা করে থাকা অসম্ভব। সম্প্রদায় গত ভাবে তারা দীর্ঘদিন পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। পরিস্থিতিকে অধিক নাজুক করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা ভীরু বা দুর্বল ও নয়। আইনতঃ আত্মরক্ষার অধিকারও তাদের আছে।

সাহসী ও কৌশলী ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে, চাকমা বিদ্রোহ দিন দিন শক্তিশালী ও বিব্রতকর হচ্ছে। রাজনৈতিক সামরিক অথবা প্রশাসনিক যে কোন উপায়ে এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দমন কার্যতঃ কঠিন নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এত দুর্বল আর অদক্ষ হলে, তার পক্ষে দেশরক্ষার বৃহৎ দায়িত্ব পালন সম্ভবই হবে না। বিদ্রোহ দমানো দেশ রক্ষার বিষয়। প্রতিবেশী সহ অন্যান্যের মত তা নির্মম ভাবে দমন করা জরুরী। ইহা শান্তি শৃংখলা সংক্রান্ত পুলিশী কাজ নয়। সঠিক সাহসী ও কৌশলী সিদ্ধান্তের দ্বারা, জনগণ ও প্রশাসনকে সমস্যা মোকাবেলার উপযোগী শক্তি যোগান হলে, গুলি বন্দুক ছাড়াও, বিদ্রোহী পক্ষের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব। ভয় ও মানসিক দুর্বলতায় বিদ্রোহী পক্ষকে কাবু করার অনেক শক্তিশালী সূত্র আছে, যা কার্যকরী করতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। সূত্রগুলি

www.pathagar.com

ক) বিদেশী পাহাড়ী সম্প্রদায়ের বিপুল লোকজনের অবাধ ও অব্যাহত অনুপ্রবেশের দ্বারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের জন সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটছে। বিগত আদম শুমারী রিপোর্ট–গুলি ইহার প্রমান। এখন সরে জমিনে অনুসন্ধান ও বাছাই এর মাধ্যমে বিদেশী উৎখাতে তৎপর হওয়া।

খ) বিদেশী বংশোদ্ভুতদের এ দেশে বেআইনীভাবে অর্জিত সহায় সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধাবাজেয়াপ্তকরা।

গ) বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ ও তাদের ধরিয়ে দিতে অপারগ আত্মীয় পরিজনদের সহায় সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা।

ঘ) বদলীহীন চাকুরী করা, বনজ সম্পদ লোট, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বাড়তি সুযোগ, জুমচাষ ও খাসজমি দখল, জুম করের কমিশন লাভ, ও ১/১৯০০ সালের রেগুলেশন এর উপজাতীয় প্রশাসন অবিলম্বে প্রত্যাহার সহ সাংবিধানিক অভিন্ন শাসন প্রয়োগ।

গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত যে, স্বপক্ষীয় বাঙ্গালী শক্তির সংখ্যা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া, এতদাঞ্চলের সার্বভৌমত্ব সুসংহত হবেনা। এখানে পাহাড়ী প্রাধান্য বজায় রাখার অর্থই হলো, ভাবী স্বাধীন জুম্ম দেশের প্রতিষ্ঠাকে অজ্ঞাতে লালন পালন করা। পাহাড়ীরা প্রকাশ্যে ইহা অস্বীকার করলেও, এপথ ধরেই ভারত বিভক্ত হয়েছে, এবং পাকিস্তান থেকে জন্ম লাভ করেছে বাংলাদেশ। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় সব বিরোধীতার মোকাবেলা করে, ত্বরিতে ও দৃঢ়ভাবে, এখানে বাঙ্গালী সংখ্যা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাঝেই প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধাননিহিত।

৭। পাহাড়ীরা শোষিত নির্যাতিত গোবেচারার দল, সরলতার সুযোগে যাদেরকে চতুর বাঙ্গালীরা অজস্র ঠকায়, এই বহুল প্রচারিত বানোয়াট অপবাদের সুবাদে, প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে আছে। ইহা কেউ জানেনা যে, বাঙ্গালী বেপারী ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাদের অনেকেই অজস্র ধার ও অগ্রিমে আবদ্ধ। সেই ধার ও অগ্রিম টাকা অজস্র মারা যায়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ধার অগ্রিম আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের বাড়ী ঘরে যাওয়া যেতো, কিন্তু আজকাল এই দুঃসাহস মানে, জান খতম করা। প্রকৃত পক্ষে পাহাড়ীরা সর্বত্র সংখ্যাগুরু। তারা স্থানীয় প্রশাসন ও

www.pathagar.com

বিচার ক্ষমতার মালিক। তাদের প্রতাপ প্রতিপত্তির কাছে বাঙ্গালীরা অপাংক্তেয়। জমি বন্দোবস্তি, খরিদ, বিক্রি, শালিস বিচার কর ও খাজনা আদায় ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা পাহাড়ী অভিজাতদের অনুগ্রহের পাত্র। এমন বাঙ্গালী কচিতই আছেন, যাঁকে পাহাড়ীদের সমীহ পেতে হয়। একমাত্র খরিদ বিক্রি ও ধার অগ্রিম নেওয়া ছাড়া, কোন পাহাড়ীর পক্ষে কোন বাঙ্গালীর দ্বারস্ত হওয়া চোখে পড়েনি। আর বাঙ্গালী সরকারী কর্মকর্তারা তো তাদেরকে অযাচিতে অজস্র অনুগ্রহ বিলান। তবু সাধারণ বাঙ্গালীরা তো বটেই, স্বয়ং সরকারও, সংঘবদ্ধ পাহাড়ী অসন্তোষ আর বিরোধীতার মুখে বিব্রত আর কোণঠাসা। এদেশে পাহাড়ীদের রাজপুত্রের আদর সুবিধা প্রাপ্য। তারা এ পর্বতাঞ্চলের যে কোথাও খাস জমি, বনজ সম্পদ ইত্যাদির ভোগ দখলের প্রথাগত অধিকারী। এর ফলে এবং জুম চাষের কুফলেও বটে, এই পর্বতাঞ্চলের বহু কোটি টাকার প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতি বৎসর দা কুড়াল আর আগুনের শিকার হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিজের জমিতে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোরা বাগান নয়, রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের বহু মূল্যবান বাঁশ, গাছ, ছন, লতা, পাতা, পাথর বালি ইত্যাদি, এবং অত্যন্ত ব্যয় ও কড়া যত্নে উৎপাদিত মূল্যবান সেগুণ গাছ, তুচ্ছ জ্বালানী কাঠের আকারে ও বটে, বেআইনী ভাবে আহরিত হয়ে, পাহাড়ীদের দ্বারা অবাধে বিকোয়। অভাব অসুবিধায় আর্থিক সহায়তার নামে, বন কর্মকর্তা ও জিলা প্রশাসকদের দ্বারা, বনজ দ্রব্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র, পাহাড়ীদের হামেশা মঞ্জুর করা হয়। নিজের জমির ভুয়া গাছ-বাগানের শুল্কমুক্ত পারমিট ও এর অন্তর্ভূক্ত। যদ্বারা যথেচ্ছ ভাবে সরকারী বেসরকারী বনাঞ্চলের গাছ, লতা পাতা, আহরিত ও লুটপাটের শিকারে পরিণত হয়। কর্ণফুলী হ্রদের নিমজ্জন ঘটনায়, অনেক খাস জায়গা জমি ও বনাঞ্চলকে, একখানা জুমকরের রসিদ বলে ও বটে, দখল বর্তিয়ে অন্যায় ভাবে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করার নজির আছে। পাহাড়ী চাকুরী জীবীরা, আজীবন কোথাও বদলী না হয়ে, নিজ বাড়ী ঘরে থেকে, চাকুরী করারসুযোগ ভোগ করেন। তদুপরি বাড়ী ভাড়ার বাড়তি সুবিধা ও তাদের প্রাপ্য। উচ্চ শিক্ষালাভ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক রেয়াতী ব্যবস্থা নির্ধারিত। পশ্চাপদও ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গুলির প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার অংশ নির্ধারিত না থাকার সুযোগে তা বৃহৎ ও শিক্ষা কৌশলে অগ্রসর সম্প্রদায় গুলি এক চেটিয়া ভোগ করছে। ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গুলি তাই তাদের দ্বারা বঞ্চনার শিক্ষার। উচ্চ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরীক্ষা ও বাছাই ক্ষেত্রে, তাদের কম যোগ্যতা গ্রহণীয়। এ যাবৎ বহু কোটি টাকার কৃষি ও শিল্প ঋণ তাদের মাঝে বন্টিত হয়েছে, অথচ আদায়ের পরিমান নগণ্য। উন্নয়ন বোর্ড সংস্কৃতি খেলা ধূলা ও সমাজ উন্নয়নের নামে কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাজার হাটে উঠা নামার সিড়ি, পাড়ার পানির ঘাট, স্কুল কলেজ, টুল, উপাসনা লয়, কারিগরি ও পেশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জুমিয়া ও ভূমিহীনদের বাড়ী ঘর ও মিলন ক্ষেত্রগুলি, পাকা করে তৈরী। জমি চারা, বীজ, পেশা উপার্জনের মেশিন, সরঞ্জাম, গরু, ছাগল, হাস মোরগ, খাদ্য, প্রাথমিক পুঁজি ইত্যাদি অনেক সরবরাহ করা হয়েছে। নিসন্দেহে ইহা ব্যাপক কল্যাণ প্রচেষ্টা যা পাহাড়ীদের প্রতি বাংলাদেশের সাধ্যাতীত তোষণ মূলক উদারতার প্রতীক। তদুপরি/উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমান বার্ষিক অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি টাকা। এমন পাহাড়ী পাড়া নেই, যেখানে চাপাকল স্থাপিত হয়নি । উচ্চ শিক্ষা আগ্রহী এমন পাহাড়ী ছাত্র ছাত্রী নেই, যে আর্থিক সাহায্য অথবা শিক্ষা বৃত্তি লাভ না করে। পাহাড়ী ছাত্রাবাস গুলি বিনা ব্যয়ে পরিচালিত হয়, এবং তা বিনোদন সরঞ্জাম ও আসবাব পত্রে সমৃদ্ধ। ১৯৯০/৯১ সালে পাহাড়ীদের জন্য আঠারো শ নুতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদায় কারীর দায়িত্ব দিয়ে, জুমকর ও ভূমিরাজস্বের উপর পাহাড়ী অভিজাতদের কমিশন দেওয়াও হয়, যা গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে অচল। ইহা পাহাড়ী তোষণ ও আভিজাত্য লালনের অভিনব নজির। সমতল বা পাহাড়ের কোন বাংগালীর ভাগ্যে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দুপ্রাপ্য। তবু বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিপক্ষে বঞ্চণা শোষন ও অত্যাচারের অভিযোগে, পাহাড়ী সমাজ শুধু সোচ্চারই নয়, বন্দুক হাতে যুদ্ধরত।

পরোক্ত বিপুল উদার ও কল্যাণকর ব্যবস্থাদি যথেষ্ট এবং সন্তোষ জনক না হলে, আর কি কি সম্ভাব্য উপায়ে, জীবন মান উন্নত ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়, শান্তিপূর্ণ, রাজনৈতিক উপায়ে তার সোপারিশ করাও সম্ভব। বাংলাদেশের সর্বাধিক শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন পাঁহাড়ী সমাজের মাঝে অনুরূপ কৌশলী ও বুদ্ধিজীবী লোক যথেষ্টই আছেন। তাদের দ্বারা উথাপনযোগ্য আশা আকাংখা গুলির পুরণ, সময় সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়। কিন্তু তদস্থলে অবাঞ্ছিত বন্দুকের ব্যবহার দুর্ভাগ্য জনক। যুক্তিকে যুক্তির দ্বারা খন্ডন বা প্রতিষ্ঠা করা যায়। দুনিয়ার তাবৎ মহৎ ও বৃহৎ সাফল্য গুলি বুদ্ধি কৌশল আর যুক্তির কৌশলী ব্যবহারের মাধ্যমেই লাভ করা গেছে। যুদ্ধ হলো ধ্বংস আর হঠকারী ব্যবস্থা। তার জয় পরাজয়ে লাভ ক্ষতি হিসাব করা যায় না। ইহার সংগঠকদের অধিকাংশকে ও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। খোদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।

মনে হচ্ছে, সংখ্যা প্রাধান্য আর ক্ষমতার একচ্ছত্রতার কম কিছুতে শান্তিবাহিনী সম্মত হবেনা। তাদের দাবী নামার কিছু বক্তব্য, আপোষ মূলক নয়। যদি কর্ণফুলী

www.pathagar.com

হ্রদের পানি সমুদ্র সমতলের ষাট ফুটের সীমানায় নামাতে হয়, তবে তাতে নদীর তীরাঞ্চল ভেসে উঠবে, যার অর্থ হবে হ্রদের ও কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের অবলুপ্তি। সাত চল্লিশ সালের পরবর্তী বাঙ্গালীদের প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক জেদ। তখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী ও পাহাড়ীরা ছিলেন ভাসমান লোক। জায়গা জমির মালিকানার হিসাবে পাহাড়ী বাঙ্গালী সবাইকে গুণতে গেলে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্যই হবে। কোটি কোটি ভূমিহীন পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সবার, জন্মগত স্বদেশ বাংলাদেশ। আইনতঃ তাদের কাউকে ভূম্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। কোন এলাকার উপর কারো একাধিকার গ্রহণীয় নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর পাহাড়ীদের সংখ্যা প্রাধান্য রক্ষা আর একাধিকারের দাবী, হঠকারী কথা। ইহা দেশের অখন্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক। বিরূপ আর বিদ্বিষ্ট পরিস্থিতিতে পৃথক স্বাধীন জুম্যা-দেশের সম্ভাবনা তাতে লুক্কায়িত। পরিকল্পনাটি এই মর্মে সন্দেহ জনক ওবিপজ্জনক।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পাহাড়ীদের সন্তুষ্টি বিধান অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিদ্রোহীদের অস্ত্রত্যাগ ও শান্ত হওয়ার আশা মরীচিকাই প্রায়। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের নিজস্ব পরিকল্পনায় অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

(খ) পাহাড়ী নৃশংসতা ও প্রতিকার

১৯৭৭ সাল থেকে বাংগালীদের পক্ষে পাহাড়ী নৃশংসতায় যে বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, তার যথার্থ পরিমাপ হয় নি। অথচ উহা ব্যাপক যুদ্ধকেও হার মানাবার যোগ্য। ধ্বংস আর উৎপীড়ণের এক ভয়াবহ তাণ্ডব, মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক করুণ নৃশংসতা, যা দুনিয়া বাসীকে হত চকিত করে দিতে পারে, তাই ঘটে গেছে, ঐ নিরিহ নিরপরাধ গরীব মানব গোষ্ঠির উপর। আশ্রয় ও পুনর্বাসন লাভের প্রাণ হানিকর ঐ উচ্চ মূল্য তাদের কাছে কাম্য ছিলোনা। সরকার নির্ধারিত নিয়তি, তাদের ধরে এনে অকারণে পাহাড়ী আক্রমণের শিকার করেছে। আক্রমণে তাদের প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি অপরিসীম। প্রাথমিক ভাবে হিসাব রাখা হয় নি। সংবাদও ছিলো নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ হতাহত ও নিখোঁজের সংখ্যা অসংখ্য। ইহা অবিশ্বাস্য, অতিরঞ্জিত বা বানোয়াট ভাবা স্বাবাবিক। কিন্তু ঘটনা প্রকৃতই তাই। ১৯৮১ সালের আদম শুমারীর হিসাব ও পুনর্বাসিতদের সরকারী সংখ্যার সাথে,

www.pathagar.com

হালের প্রকৃত বাঙ্গালী ও পুনরবাসিতদের সংখ্যার যোগ বিয়োগের ফলাফলে অন্ততঃ লক্ষ জনের গরমিল আছে। উহাই নিহত নিখোঁজ ও পলাতক বাঙ্গালীদের সংখ্যা।

দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদ সংস্থার দ্বারা প্রচারিত সংঘর্ষ ক্ষয় ক্ষতি ও প্রাণহানির অসংখ্য খবরের বাহিরে অতিরিক্ত নৃশংস ঘটনায় পুণর্বাসিত বাঙ্গালীদের বিশাল সংখ্যায় হতাহত ও নিখোঁজ হওয়ার বহু ঘটনা, চেপে রাখা হয়েছে, প্রচার করতে দেওয়া হয়নি । এভাবে অভানীয় সস্তায় আর অবহেলায় বিপুল বাঙ্গালী গরীবের প্রাণ গেছে, যাদের অধিকাংশের সৎকারও হয় নি । সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য অত্যাচারে তো বটেই, অসংখ্য গোপন ও আকস্মিক আক্রমণে, দুর্গম নির্জন বনে ও পাহাড়ে, অনেক জেলে, কাঠুরিয়া চালি বাহক, মাঝি মল্লা চাষী, শ্রমিক বেপারী যাত্রী ইত্যাদি গুম খুন ও অপহৃত হয়েছে। ঐ অপহৃতদের অতি ভাগ্যবান দুচার জন মাত্র, অতি উচ্চ নগদ পণ মুল্যে নিজেদের মুক্তি কিনে নিতে পেরেছেন। অবশিষ্ট বিপুল সাধারণ অপহৃতরা কখনো ফিরে আসে নি । তারা চির দিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এমনি করে নীরবে অজ্ঞাতে হাজার হাজার বাঙ্গালী হতাহত হয়েছে। এদের নিহত হওয়ার রহস্যজনক অঘটন, জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এর জন্য দায়ী সরকার ও শান্তি বাহিনী। ইহা মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক বিরাট অপরাধ। এর বিচার ও শাস্তি বিধানআবশ্যক।

সরকারী দলিল ও ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, প্রকৃত পক্ষে, পার্বত্য চট্টগ্রামরাসী অধিকাংশ পাহাড়ী এ দেশে বহিরাগত শরণার্থী। খোদ চাকমা ইতিহাসকারগণ স্বীকার করেছেন, চাকমা সম্প্রদায় মোগল শাসনের শেষাংশে মগ শক্তির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ পুর্ব চট্টগ্রামের মাতামুহুরী নদী উপত্যকার বারটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী আরাকানী, যারা তৎপুর্বে কোন এক চম্পক নগরের অধিবাসী ছিলেন। এরাসহ মগ বা মারমা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ১৭৮৪ সালের বর্মী আক্রমণে পালিয়ে আসা আরাকানী উদ্বাস্তু। অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এমনি বিভিন্ন ঘটনায় পালিয়ে আসা পুনর্বাসিত ভিন দেশী নাগরিক। সুতরাং এরা এখানকার ভূমিজ সন্তান নয়। ইহা তাদের স্বদেশও নয়, আবাস ভূমি মাত্র।

এতদাঞ্চরের পাহাড়ী জনসাধারণের রাজনৈতিক মর্যাদার নির্ভরযোগ্য দলিল হলোঃ বাংলা সরকারের চিঠি নং ২৯৫ তাং ২১/১/১৮৭০ যদ্বারা রানী কালিন্দি কর্তৃক উত্থাপিত জমিদারী সত্বের দাবী প্রত্যাখ্যাত এবং একই সাথে পাহাড়ী

www.pathagar.com

জনসাধারণের স্থায়ী ভূমি স্বত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। তবু জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে, সম্পূর্ণ অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে জুম চাষে বাধা দেওয়া হয় নি । ১৯০০ সালের শাসন বিধিতে ও তাদের স্থায়ী ভূমি স্বত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। অথচ নাগরিকত্বের প্রধান অবলম্বনই হলো ভূমিস্বত্ব। জুম চাষের, অনুমতি, প্রচলিত ভূমি বন্দোবস্তি নয়। ইহা এমন একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, যদ্বারা উৎপাদিত ফল ফসল ছাড়া, জমি ও তার অন্য সব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর, অধিকার বর্তায় না। জুম চাষ হলো ভ্রাম্যমান কৃষি ব্যবস্থা, যা এতদাঞ্চলের পাহাড়ীদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান পেশা। খোদ ঐ পেশাই তাদের যাযাবর ও অস্থায়ী লোক হওয়ার প্রমান। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ঘটনা বাদে বহু সংখ্যক লোকসম্বলিত সমাজ ও সম্প্রদায়কে, ভূমি স্বত্ব হীন রাখা তখনই সম্ভব, যখন তাদের আইনতঃ তা অর্জনের অধিকার থাক না। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আশ্রয় ও জুম চাষে বাধা না দেওয়ার কারণে এ দেশের সম্পদ ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষতি পুরণ স্বরূপ জুম কর আরোপ করা হয়েছে, যা পাহাড়ীদের একমাত্র দেয় রাজস্ব। ইহাও তাদের সীমিত অধিকারের স্মারক। জুম কর উশোল ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যম হিসাবে সরকারী প্রয়োজনে তিন গোত্র প্রধানকে সর্দার নিযুক্ত করা হয়েছে, পাহাড়ীদের পরিভাষায় তারাই হলেন রাজা। এই সর্দারী স্বত্ব মানুষ ভিত্তিক। এর সাথে ভূমি স্বত্বের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং বংশানুক্রমিক স্থায়ী ভূমি স্বত্ব আর জন্ম মৃত্যুর মিলিত উপাদানে, পাহাড়ীদের নাগরিক অধিকার গড়ে উঠে নি । অস্থায়ী জুমিয়া সম্প্রদায় হিসাবে তাদের মর্যাদা বা পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই নির্ণীত হয়ে আছে। এখন তা স্থায়ী নাগরিকের মর্যাদায় আইনতঃ উন্নীত হবার আগে, তাদের কোন রাজনৈতিক দাবী বিবেচনার যোগ্য ইনয়।

অস্থায়ী বসবাস ও জুম চাষের একমাত্র আইনানুগ অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে এখন অধিকাংশ পাহাড়ী অতিরিক্ত সুযোগ হিসাবে, জায়গা, জমি ব্যবসা, চাকুরী, পদ ও পদবীর মালিক হয়েছেন, যা আইনতঃ নাকচ হওয়ার যোগ্য। ইতিহাস বিস্মৃতি ও ভূলের কারণেই এসব ঘঠেছে। এই অবহেলা পুর্ণ ত্রুটির সংশোধন হতে পারে পাহাড়ী সমাজকে তাই তাদের আইনসঙ্গত যথা মর্যাদায় নেমে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত।

দীর্ঘ দিনের বসবাস, সংখ্যা প্রাচুর্য আর জন্ম মৃত্যুতে, কখনো, কোন বিদেশ, স্বদেশে, পরিণত হয় না। সৌহার্দ্য পুর্ণ আচরণ ও আনুগত্যের দ্বারা দেশের স্থায়ী নাগরিকদের সমর্থন আদায় তজ্জন্য আবশ্যক। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায় কয়েক লক্ষ

www.pathagar.com

তামিল দীর্ঘ বসবাস আর অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর পরেও ভারতীয় নাগরিক হয়ে আছে। ভারত তাদের ফিরিয়ে নিতে রাজি। ফিজিতে ভারতীয়রা সংখ্যা গুরু এবং শতাব্দীর প্রাচীন বাসিন্দা। তবু তাদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত নয়। আফ্রিকার দেশে দেশে ভারতীয়রা দীর্ঘ কালের বাসিন্দা। তবু উগাণ্ডা থেকে তারা বিতাড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের অধিকার বিতর্কিত। আর অন্যান্য দেশে বহিরাগত বলে চিহ্নিত। পুর্ণ নাগরিকত্বের অধিকারী নয়। দুনিয়ার দেশে দেশে ইহুদীরা প্রাচীন উদ্বাস্তু জাতি। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, কোথাও তাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত নয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ বসবাস আর বিপুল জন্ম মৃত্যু, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে, নাগরিক অধিকার অর্জনের নিশ্চিত ভিত্তি নয়। বংশানুক্রমিক ভূমি স্বত্বই, বসবাস ও জন্ম মৃত্যুর সাথে যুক্ত হয়ে অধিকার সুনিশ্চিত করে। এখানকার পাহাড়ী জনসাধারণের তা নেই, এবং তা এখনো মঞ্জুর সাপেক্ষ। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রচণ্ড রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি, দেশের প্রধান সম্প্রদায় বাঙ্গালীদে মনে, প্রতিহিংসাই জাগাবে এবং তাতে পাহাড়ীদের বিদেশী শরণার্থী ঘোষণার দাবী উঠা সম্ভব। এই পরিস্থিতিকে অনুকূলে রাখতে তাদের অবিলম্বে, অনুগত সংখ্যা-লঘুর মর্যাদা, মেনে নেওয়া উচিত, এবং হিংসা আর অস্ত্র পরিত্যাগ করা আবশ্যক। নতুবা একদা হারিয়ে যাওয়া স্বদেশ ভূমি নুতন করে খুঁজে নেওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া, তাদের পক্ষে অনিবার্য। অতিষ্ট বাংলাদেশীদের দ্বারা একবার বিদেশী ঘোষিত হয়ে গেলে, এ দেশে তাদের অবস্থান ও তৎপরতা এবং কর্তৃত্ব আর অধিকারের দাবী দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। তখন বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে, পাহাড়ী বা তাদের কোন মুরব্বীর মুখ খোলা বা অস্ত্র ধারণ কঠিণ হবে।

বাঙ্গালীরা নিরিহ নির্বিরোধ আর ধৈর্যশীল না হলে, অনেক আগেই, পাহাড়ীদের উস্কানীমুলক উগ্র-উদ্ধত আচরণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতো। এতদিনে শরণার্থী ঘোষিত হয়ে সমুদয় সহায় সম্পত্তি আর সুবিধা সুযোগ হারিয়ে তাদেরকে উৎখাত হতে হতো। নিজেদের উদ্ধত আচরণের ফল সরূপ উহা হতো তাদের প্রাপ্য। তবু এর বিকল্প হলো অনুগত সংখ্যা লঘুর মর্যাদায় শান্তিপুর্ণ বসবাস। পাহাড়ী সমাজের পক্ষে এ প্রশ্নটি চুড়ান্ত ফলাফল নির্ণায়ক গুরুত্ববহ। ইহা গ্রহণ বর্জনের উপর নির্ভর করে তাদের এ দেশের নাগরিক অধিকার নিয়ে নিরুপদ্রবে বসবাস, অথবা বিদেশী শরণার্থীর মর্যাদা লাভ। মনে রাখা দরকার এতদাঞ্চল হলো বাংলাদেমের ১০% কিন্তু পাহাড়ীদের অনুপাত হলো সারা দেশের লোক সংখ্যার $\frac{১}{২}$

www.pathagar.com

% মাত্র। এই $\frac{১}{২}$ % লোকের দেশের ১০% এলাকার উপর কর্তৃত্বের দাবীর অর্থ হলোঃ সীমাহীন বাড়াবাড়ি। বর্ণিত এই ১০% ভূমির অধিকাংশ জাতীয় বনাঞ্চল, বসতি অঞ্চলনয়।

সরকার দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং সম্পূর্ণ অদুরদর্শিতারসাথে স্বপক্ষীয় জনশক্তি ভূমিহীন বাঙ্গালীদের পুনর্বাসন, স্থগিত রেখেছেন। নিহত নিখোঁজ বাঙ্গালীদের জানমালের ক্ষতি পুরণ দানের মানবিক দায়িত্বটিও পালিত হয়নি । এ পরিস্থিতিতে নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন বাঙ্গালীদের আছে। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের একা সরকার ও সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করা পুরাপুরি সফল প্রমাণিত হয়নি । তাই নিগৃহীত বাঙ্গালীরা শান্তিবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসাবে সংগঠিত হবার প্রয়োজন অনুভব করছে। বিশেষতঃ সেনাবাহিনী সীমান্ত রক্ষায় নিক্রান্ত হলে, নিজেদের আত্মরক্ষার দায়িত্ব বাঙ্গালীদের নিতেই হবে, এবং দেশ রক্ষায় ও শক্তি যোগাতে হবে। বিদ্রোহীরা পঞ্চম বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত হলে, তাদের প্রতিরোধ ও নির্মূল করা জরুরী হয়ে পড়বো তাই এই দেশ ও জাতির পক্ষে বাঙ্গালীদের দায়িত্ব অনেক। সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত না হলে শত্রু মিত্র কারো কাছেই বাঙ্গালীরা গণ্য হবেনা। প্রতিটি বাঙ্গালীকে একক সাংগঠনিক নীতি নির্দেশের আওতাভূক্ত করা গেলে, তাদের অবস্থান হবে দৃঢ়; এবং শক্তি হবে মোকাবেলার যোগ্য। পার্বত্য সংকটে তখন তারা হবে আরেক শক্তিশালী পক্ষ। তাই ক্ষুদ্রাকারে হলেও, ইতিমধ্যে তাদের শান্তিবাহিনীর প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, আশা ব্যঞ্জক ঘটনা।

সংখ্যার হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীরা একক প্রধান সম্প্রদায়। খরিদ বিক্রি লেন দেন, যাতায়াত ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে, গোটা অঞ্চলকে অচল করে দিবার ক্ষমতা তাদের আছে। তদুপরি তারা স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষার স্বেচ্ছা সৈনিক। এতদাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের নৈতিক দায়িত্ব তাদের আছে। নিম্নোক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠন গড়ে তোলা আবশ্যক।

ক) শত্রুর মোকাবেলা ও নিজেদের নিরাপত্তা বিধান।

খ) স্বপক্ষীয় জনশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা এতদাঞ্চলের সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা।

গ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য অদিকার ও অংশ আদায়।

www.pathagar.com

ঘ) দুস্থ বিপন্নদের উদ্ধার ও সাহায্য দান।

ঙ) ক্ষুদ্র অসহায় সংখ্যা–লঘুদের রক্ষা, পক্ষাবলম্বন ও কল্যাণ সাধন।

চ) জুমিয়া জাতীয়াতাবাদ বর্জন, অনুগত সংখ্যা লঘুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আলোচনার দ্বারা বিরোধ মীমাংসার নীতি অনুসরণ।

ছ) সংঘাত সংঘর্ষে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে, প্রত্যেক শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, নারী আহত অসুস্থ ও আশ্রয় প্রার্থীকে সেবা সাহায্য ও নিরাপত্তা দান।

জ) সাংগঠনিক ভাবে শান্তির আন্দোলন পরিচালনা।

পাহাড়ীদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, একটানা নির্দয় অস্ত্র প্রয়োগ, আর নির্মম অত্যাচার,পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।। রাজনৈতিক কারণে পাহাড়ীদের কাছে স্বদেশী বাঙ্গালীরা, মানবিক ও দরদী আচরণও পায়নি । ফলে দুটি সমাজই পরস্পরের শত্রুতে পরিণত। তবু উভয়ের মিলিত শান্তিপুর্ণ আন্দোলনের দ্বারা এতদাঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্জন সম্পূর্ণ সম্ভব। একমাত্র বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের দ্বারাই সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ। আদি বাঙ্গালীদের যতই আশ্বস্ত করা হোক, বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনে তারা ও পাহাড়ী সমাজের অসহায় জিন্মি হওয়ার আশংকায় ভীত। ক্ষুদ্র সংখ্যা লঘু পাহাড়ী সম্প্রাদায় গুলি বড় সশস্ত্র সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরোধীতায় সাহসী ও সোচ্ছার হতে না পারলে ও সন্দেহে কাতর। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের মোকাবেলায় শক্তি ও সংখ্যায় ক্ষুদ্র হওয়াতে বিদ্রোহী পাহাড়ীদের সামরিক বিজয় লাভ, যুক্তি গ্রাহ্য নয়। পাহাড়ীদের সশস্ত্র আন্দোলনই বাঙ্গালী পুনর্বাসন ও সামরিক উপস্থিতির প্রধান কারণ। নমনীয় হলে বাঙ্গালী পাহাড়ী ভার–সাম্য বজায়ের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন ও সম্মান জনক মীমাংসা এখনো সম্ভব। একক পাহাড়ী সুবিধাবাদ, মীমাংসার সূত্র হওয়ার যোগা নয়। উভয় পক্ষকে গ্রহণ বর্জনের ছাড় দিতে হবে। ব্যাপক বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও পাহাড়ী সংখ্যা প্রাধান্য বজায় রাখার সিদ্ধান্তে কোটি কোটি ভূমিহীনদের চাপের মুখে তা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। বাঙ্গালী পুনর্বাসনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পাহাড়ী স্বার্থরক্ষার বিকল্প খুঁজে নিতে হবে। সশস্ত্র আন্দোলনের কুফল ও ব্যর্থতাকে অকপটে স্বীকার করে, কৌশল পরিবর্তন করা দরকার। সারা বাংলাদেশী জাতি দেশের স্বাধীনতাকে

www.pathagar.com

ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে উদগ্রীব। সে বৃহত্তর আন্দোলন থেকে সংখ্যা লঘু পাহাড়ী সমাজের বিচ্ছিন্ন থাকা, আর বাঙ্গালী বিদ্বেষী হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। পাহাড়ী পক্ষের অস্ত্র সম্বরণকে শান্তির উদ্যোগ হিসাবে স্বাগত জানাতে বাঙ্গালীরা প্রস্তুত। অস্ত্রের চেয়ে যুক্তি অধিক শক্তিশালী। সুতরাং যুক্তি ও শান্তির অনুশীলনই কাম্য।

(আগষ্ট ১৯৮৮ ইং)

www.pathagar.com

এই লেখকের কিছু প্রকাশমান বইঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি (ইতিহাস খন্ড ও রাজনীতি খন্ড)

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের রূপ ও রহস্য—১ম ও ২য় খন্ড

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

১। রাঙ্গামাটি প্রকাশনী
রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি

২। ডি, এস, বি কলোনী
রাঙ্গামাটি।